জিন্দা লাশ: মানব-অঙ্গ বাজারের জৈব সন্ত্রাস

মনির মনিরুজ্জামান

কিডনি, লিভার, কর্নিয়ার মতো বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চাহিদা মানব-শরীরের বিভিন্ন অংশের এক অবৈধ বাজার সৃষ্টি করেছে। নৃবৈজ্ঞানিক মাঠ গবেষণার ভিত্তিতে এই লেখায় মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটির নৃবিজ্ঞানী মনিরুজ্জামান বাংলাদেশের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বাজার, বিশেষ করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রয় পদ্ধতি এবং এই বাণিজ্যের শিকার বিভিন্ন কিডনি বিক্রেতার অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করেছেন। কিডনি বিক্রেতাদের আখ্যান থেকে দেখা যায়, অর্থবান ক্রেতা ও দালালরা কেমন করে বাংলাদেশের দরিদ্রদের কিডনি বিক্রি করতে প্রলুব্ধ করে; দিনশেষে যাঁরা প্রতারিত হন এবং কিডনি বিক্রি করার পর যাঁদের দুর্ভোগের শেষ থাকে না। মানব-অঙ্গের এই পণ্যায়ন কতটা শোষণমূলক ও অনৈতিক, কীভাবে এক জৈব সন্ত্রাসের মাধ্যমে গরিবের শরীর থেকে অঙ্গ স্থানান্তর করা হয় এবং কায়েমি স্বার্থে তা আড়াল করে রাখা হয় তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

'শিয়াল যখন মুরগি ধরে, মুরগিটা তখন ডাক পাড়ে। আমি হইলাম এই মুরগি আর খদ্দের হইল একটা শিয়াল। অপারেশনের দিন মনে হইতেছিল, আমি একটা কোরবানির গরু।'

–দিদার, ৩২ বছর বয়সী বাংলাদেশি রিকশাচালক, যিনি তাঁর একটি কিডনি বিক্রি করেছেন।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ট্রান্সপ্লান্টেশন বা প্রতিস্থাপন প্রযুক্তির 'অলৌকিক' সাফল্যের সাথে সাথে চিকিৎসাসেবার বাণিজ্যিকীকরণ এবং ধনী-গরিবের বৈষম্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মানব-অঙ্গের এক অবৈধ কিন্তু জমজমাট বাণিজ্যের শর্ত তৈরি হয়েছে। এই লেখায় আমি কিডনি বিক্রেতাদের১ ওপর পরিচালিত নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিত্তিতে বাংলাদেশের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাজারের একটি বিশ্লেষণ হাজির করব। এই কিডনি বিক্রেতাদের জীবন্ত শরীর রীতিমতো মানব-অঙ্গ চাষাবাদের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। কতগুলো প্রশ্ন সামনে রেখে আমার অনুসন্ধানটি পরিচালিত হয়েছে: দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অঙ্গ কেমন করে পণ্যে পরিণত হচ্ছে? তাদের জীবন্ত শরীর ও সত্তার ওপর এই পণ্যায়নের প্রভাব কী কী? অঙ্গ পণ্যায়নের সাথে বৃহত্তর সামাজিক কাঠামো ও ব্যক্তিগত নৈতিকতার বিষয়টি কিভাবে সম্পর্কিত? সর্বজনীন মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্নটিও এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। কেননা অঙ্গ প্রতিস্থাপন বা অরগান ট্রান্সপ্লান্টেশনের মতো আধুনিক চিকিৎসা অনেক সময়ই সামর্থ্যহীনের জীবনের চেয়ে সামর্থ্যবানের জীবন দীর্ঘায়িত করার সিস্টেমকে জায়েজ করার চেষ্টা করে। আমরা দেখাতে চাই, অঙ্গের এই পণ্যায়ন মারাত্মক শোষণমূলক ও নৈতিক বিচারে নিন্দনীয়; কেননা এক অভিনব জৈব সন্ত্রাসের মাধ্যমে গরিবের শরীর থেকে অঙ্গ বের করে নেওয়া হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ একটি উদীয়মান মানব-অঙ্গ বাজার। বাংলাদেশে এই বাজারের অস্তিত্ব এক দশকেরও বেশি সময় ধরে। জাতীয় গণমাধ্যমগুলো নীরবে এই বাজারকে অনুমোদন করেছে। কিডনি, লিভার, কর্নিয়াসহ প্রতিস্থাপনযোগ্য মানব-অঙ্গের শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন এখানে অবলীলায় প্রকাশিত হয়। এই ব্যবসায় বেশ কিছু দালাল তাদের নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করেছে এবং মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে এই ব্যবসা পরিচালনা করছে। চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরাও এই অবৈধ বাণিজ্যের সুবিধাভোগী।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ একটি উদীয়মান মানব-অঙ্গ বাজার। বাংলাদেশে এই বাজারের অস্তিত্ব এক দশকেরও বেশি সময় ধরে। জাতীয় গণমাধ্যমগুলো নীরবে এই বাজারকে অনুমোদন করেছে। কিডনি, লিভার, কর্নিয়াসহ প্রতিস্থাপনযোগ্য মানব-অঙ্গের শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন এখানে অবলীলায় প্রকাশিত হয়। এই ব্যবসায় বেশ কিছু দালাল তাদের নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করেছে এবং মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে এই ব্যবসা পরিচালনা করছে। চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরাও এই অবৈধ বাণিজ্যের সুবিধাভোগী। বাংলাদেশ ১৯৯৯ সালে অরগান ট্রান্সপ্লান্ট অ্যাক্ট পাস করে, যেখানে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবসা ও তার বিজ্ঞাপন প্রকাশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই আইন ভঙ্গ করলে সর্বনিম্ন তিন থেকে সর্বোচ্চ সাত বছর জেল ও কমপক্ষে তিন লাখ টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে (দেখুন বাংলাদেশ গ্যাজেট, ১৯৯৯: ১৮১৯)। এতদসত্ত্বেও বাংলাদেশে মানব-অঙ্গ বাণিজ্য বেড়েই চলেছে। এখানে একটি কিডনির গড় মূল্য বর্তমানে এক লাখ টাকা। দরিদ্র সংখ্যাগরিষ্ঠের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবাধ সরবরাহ থাকার কারণে এই মূল্যহার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে।

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ও বৃহৎ নৈতিক প্রপঞ্চ হিসেবে মানব-অঙ্গ বাজারের পুনঃ পুনঃ তত্ত্বায়ন হয়েছে। এই বাজার বিনিময় ও আহরণের বৃহত্তর পদ্ধতির সাথে জড়িয়ে আছে, উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সম্পর্কের গতি-প্রকৃতির সাথে মিশে আছে। দখল, উপনিবেশীকরণ ও লুণ্ঠনের ঐতিহাসিক সম্পর্কটি তৃতীয় বিশ্বের শরীরগুলোকে কাঁচামালে পরিণত করেছে। এর ফলাফলস্বরূপ মারাত্মক শোষণের শিকার হয়েছে তৃতীয় বিশ্ব, যেখানকার দরিদ্র জনগণ পশ্চিমের কতিপয়ের দীর্ঘ জীবনের জন্য মানব-অঙ্গ সরবরাহকারীতে পরিণত হয়েছে। ন্যান্সি শেপার ও হিউ যেমন বলেছেন, মানব-অঙ্গের গতিপথ পুঁজির গতিপথকে অনুসরণ করে– দক্ষিণ থেকে উত্তরে, তৃতীয় বিশ্ব থেকে প্রথম বিশ্বে, দরিদ্র থেকে ধনীর কাছে, কালো থেকে সাদা মানুষের দিকে এবং নারী থেকে পুরুষের দিকে যায় (শেপার-হিউ, ২০০০: ১৯৩)।

শিমাজনো দেখিয়েছেন, চিকিৎসা পর্যটন হলো অঙ্গ পাচারের সবচেয়ে প্রচলিত একটি উপায়, যেখানে সম্ভাব্য গ্রহীতা অঙ্গ প্রতিস্থাপনের জন্য নির্দিষ্ট দেশে ভ্রমণ করে এবং সেখান থেকে অঙ্গ ক্রয় করে (যেমন–জাপানের ক্রেতা কর্তৃক চীনে গিয়ে চীনা বন্দির কাছ থেকে অঙ্গ ক্রয়)। এছাড়া বিভিন্ন দেশের জীবন্ত অঙ্গ বিক্রেতাদের ক্রেতার নিজ দেশে নিয়ে এসে সার্জারির ঘটনার কথাও জানা যায় (যেমন–মলদোভার একজন বিক্রেতাকে আমেরিকার গ্রহীতা কিংবা নেপালি বিক্রেতাকে ভারতীয় গ্রহীতার কাছে নিয়ে আসা)। অন্যান্য ক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন দেশের গ্রহীতা ও বিক্রেতা তৃতীয় আরেকটি দেশে গিয়ে অঙ্গ প্রতিস্থাপন সম্পন্ন করে (যেমন–একজন ইসরাইলি ক্রেতা ও পূর্ব ইউরোপীয় বিক্রেতার দক্ষিণ আফ্রিকা গমন) (শিমাজনো, ২০০৭:৯৫৬-৯৫৭; আরো দেখুন শেপার-হিউ, ২০০৫: ২৬)।

অন্যদিকে আমার গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু হলো অভ্যন্তরীণ অঙ্গ পাচার, যা

জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজ করে। বাংলাদেশে অঙ্গ পাচারের সাধারণ দৃশ্যপট হলো, স্থানীয় গ্রহীতা (প্রায় সব ক্ষেত্রেই এরা ধনী) দেশীয় বিক্রেতাকে নিয়ে বিদেশে গিয়ে অঙ্গ প্রতিস্থাপন করে। অর্থাৎ ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই বাংলাদেশের, যারা বিদেশে, প্রধানত ভারতে গিয়ে প্রতিস্থাপনের কাজ সম্পন্ন করে। কিছু ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত ক্রেতা ও গরিব বিক্রেতা দেশের ভেতরেই অঙ্গ প্রতিস্থাপন করে। খুব অল্প কিছু ঘটনা পাওয়া যায়, যেখানে ধনী ক্রেতা বিদেশে গিয়ে সেখান থেকে অঙ্গ কিনে প্রতিস্থাপন করে; যেমন: বাংলাদেশি ক্রেতা পাকিস্তানে গিয়ে পাকিস্তানি বিক্রেতার কিডনি গ্রহণ করে। অন্য কতগুলো ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক গ্রহীতা (যারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত বিদেশি নাগরিক) ও বাংলাদেশি বিক্রেতা বিদেশে গিয়ে অঙ্গ প্রতিস্থাপন করে (যেমন: উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ বা মধ্যপ্রাচ্যের গ্রহীতা এবং বাংলাদেশি বিক্রেতা)।

চিকিৎসা নৃবিজ্ঞানীরা অঙ্গ পাচার নিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় কেন্দ্রীয় ভূমিকা রেখেছেন। তাঁরা শরীরের অঙ্গকে পণ্যে রূপান্তরের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। এর পেছনে তাঁরা যুক্তি দেখিয়েছেন, এই পণ্যায়নের চর্চাটি মূলত অভাবী মানুষের দুর্দশাকে পুঁজি করে চলে, বিশেষত গরিব এখানে কেবল বিক্রেতা হিসেবে অংশ নিতে পারে বলে এটা একটা শোষণমূলক চর্চা। শেপার ও হিউ যেমন বলেছেন, এই কিম্ভূত বিশেষায়িত অঙ্গ-বাজার এক ধরনের 'চিকিৎসা-বর্ণবাদের (মেডিক্যাল অ্যাপারথিড) জন্ম দিয়েছে, যেখানে দুনিয়াটা অঙ্গ ক্রেতা ও বিক্রেতায় বিভক্ত এবং সামাজিক-নৈতিক-চিকিৎসাকেন্দ্রিক এমন এক ট্র্যাজিডির জন্ম দিয়েছে, যার পুরো চিত্রটি এখনও পরিষ্কার হয়ে ওঠেনি (শেপার-হিউ, ২০০৩খ: ১৬৪৮)। একইভাবে লরেন্স কোহেন দেখিয়েছেন, অঙ্গ প্রতিস্থাপনের নৈতিক জগতে জৈব প্রযুক্তির অগ্রগতি ও চিকিৎসাসেবার বাণিজ্যিকীকরণ সমার্থক হয়ে উঠেছে। অথচ গরিবের জীবন রক্ষাকারী চিকিৎসার সুব্যবস্থাপনার কথা কল্পনায়ও আসে না (কোহেন, ১৯৯৯: ১৪৯; আরো দেখুন স্যানাল, ২০০৪)। নৃবিজ্ঞানীরা আরো বলেছেন, নির্দিষ্ট কতগুলো জীবন্ত উপাদানকে কখনও বাণিজ্যিকীকরণ করা উচিত হবে না, কারণ তা মানবতা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কাজ করে (ফক্স ও সোয়াজেয়ি, ১৯৯২; জোরালেমন, ২০০১; টোবের, ২০০৭)।

অঙ্গ পাচারের বিষয়টি নিয়ে চিকিৎসা নৃবিজ্ঞানীরা সমালোচনা ও বিশ্লেষণ করেছেন, কিন্তু যে সন্ত্রাসের মাধ্যমে একটা নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর শরীর থেকে অঙ্গ কেটে নেওয়া হয়, সে বিষয়টি তেমন আলোচিত নয়। আমি এর নাম দিয়েছি বায়োভায়োলেন্স বা জৈব সন্ত্রাস। আমি মনে করি, বায়োভায়োলেন্স হলো শারীরিক, কাঠামোগত ও সিম্বোলিক ভায়োলেন্সের একটা সম্মিলন, যার মাধ্যমে গরিবের নিপীড়িত শরীর থেকে অঙ্গ কেটে নেওয়া হয়।

বায়োভায়োলেন্স কী?

বায়োভায়োলেন্স বা জৈবসন্ত্রাস হলো নতুন চিকিৎসা প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে জীবিত বা মৃত মানব-শরীরকে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে বহুবিধ শোষণের ক্ষেত্র বানানোর একটি উপায়। বস্তুত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হস্তক্ষেপ ও ইচ্ছাকৃত ক্ষতিসাধনের মাধ্যমে চূড়ান্ত শারীরিক শোষণই হলো জৈব সন্ত্রাস। শুধুমাত্র শরীর থেকে অঙ্গ কেটে নেওয়াই নয়, 'বায়োভায়োলেন্স' বলতে ভুক্তভোগী মানুষ, যাদের অধিকাংশই গরিব, তাদের শরীর শোষণের সমস্ত প্রক্রিয়াটিকেই বোঝানো হয়ে থাকে (যেমন: অঙ্গ সংগ্রহের জন্য প্রতারণা ও কৌশল ইত্যাদি)। বায়োভায়োলেন্স প্রযুক্তিগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি উপজাত এবং বঞ্চিত সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের শারীরিক ক্ষতির বিনিময়ে কতিপয় সম্পদশালীর চিকিৎসা প্রয়োজন ও বাসনা পূরণের একটি কাঠামোগত শোষণযন্ত্র। উদাহরণস্বরূপ, জৈব প্রযুক্তির সাম্প্রতিক উৎকর্ষ ক্ষুদ্র সুবিধাভোগী কিছু মানুষের শারীরিক পরিবর্তন, কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি বা জীবন দীর্ঘায়িত করার জন্য মানব-শরীরকে অঙ্গ, টিস্যু, ভক্রাণু, রক্ত ইত্যাদি ১৫০টি পুনর্ব্যবহারযোগ্য অংশে বিভক্ত করেছে (হেজেস অ্যান্ড গেইনস, ২০০০)। বায়োভায়োলেন্সের মাধ্যমে প্রায় সব ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র গরিবের শরীর থেকে এই খুচরা অংশগুলো (স্পেয়ার পার্টস) খুলে নেওয়া হয়। একইভাবে প্রজনন সহায়তা দেওয়ার বিভিন্ন প্রযুক্তি (যেমন–ইন-ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন) আরেক ধরনের বায়োভায়োলেন্সের জন্ম দিয়েছে, যেখানে দরিদ্র মাতাকে বাধ্য হয়ে নিজের শারীরিক ক্ষতির বিনিময়ে হলেও ধনী অনুর্বর দম্পতির সন্তান গর্ভে ধারণ করতে হয়। সেক্ষেত্রে অন্যের সন্তান ধারণকারী মায়ের (স্যারোগেট মাদার) শরীরটা অক্ষত থাকে, পক্ষান্তরে অঙ্গ-বাণিজ্যের বেলায় কিডনি বিক্রেতার শরীর খণ্ডিত হয়। বায়োভায়োলেন্সকে বিশেষত বাংলাদেশের অঙ্গ বাজারের প্রেক্ষাপটে বুঝতে হলে কাঠামোগত প্রক্রিয়া ও ব্যক্তিগত দায়দায়িত্বকে পরস্পর বিযুক্ত না করে বরং একসঙ্গে মন্থন করা প্রয়োজন। সে কারণেই আমি খুঁজে দেখব জীবন্ত গরিব মানুষের শরীর থেকে অঙ্গ কেটে নেওয়ার জন্য কিভাবে জৈব সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে, কিভাবে একটি বিশেষ প্রেক্ষিতে এটিকে যুক্তিযুক্ত 'কিন্তু' গোপন রাখা হচ্ছে। এটি কি সামাজিক ন্যায়বিচার ও মানবাধিকারের নীতির পরিপন্থী? সব শেষে চেষ্টা করব বায়োভায়োলেন্সের চিকিৎসাবিষয়ক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক শাখা-প্রশাখাগুলো দেখানোর। জৈব সন্ত্রাসকে ক্ষতিগ্রস্তের ভোগান্তির মাধ্যমে কত দূর পর্যন্ত অনুধাবন করা যায়? বায়োভায়োলেন্স কি শরীর ও মনের কার্যকারণগত ভারসাম্য বিনষ্ট করে? এত সব প্রশ্নের উত্তরে জৈব সন্ত্রাসকে বিশ্লেষণ করব বাংলাদেশি রাষ্ট্র, জাতীয় গণমাধ্যম, স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও অঙ্গ ক্রেতার (গ্রহীতা ও দালাল উভয়েই) এবং সেই সাথে কিডনি বিক্রেতার জটিল প্রেক্ষাপট থেকে, যারা সবাই মিলিতভাবে এই ব্যবসাকে টিকিয়ে রেখেছে।

> সাক্ষাৎকারে বেশির ভাগ বিক্রেতাই বলেছেন, দালালরা তাঁদের একটি 'ঘুমিয়ে থাকা' কিডনি 'দান' করার ব্যাপারে ক্রমাগত উৎসাহিত করতে থাকে।

ধনী গ্রাহকদের কাছে কিভাবে সাধারণভাবে গরিব মানুষেরা কিডনি বিক্রি করছে, আমার নৃতত্ত্ববিদ্যা ক্ষতিগ্রস্তের চোখ দিয়ে সেই জৈব সন্ত্রাস বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছে। নিজের অঙ্গ বিক্রি করে দেওয়ার পর এই অঙ্গ বিক্রেতাদের যাপিত বাস্তব অভিজ্ঞতা কী? বিক্রয়-পরবর্তী সময়ে তাঁরা কি এই অঙ্গ ব্যবসাকে সমর্থন করছেন, নাকি বিরোধিতা? বায়োভায়োলেন্সের প্রক্রিয়া ও ব্যাপ্তি পরিভ্রমণ করে আমি বিস্তৃতভাবে বলব, একটি নয়া উদারনৈতিক রাষ্ট্র, স্বাস্থ্যসেবার বাণিজ্যিকীকরণ ও দারিদ্র্যের নিষ্পেষণের মিলিত ক্রিয়ায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ন্যায়বিচার ভূলুণ্ঠিত করে, তাদেরকে জিন্দা লাশে পরিণত করে কিভাবে অঙ্গগ্রহীতা দীর্ঘ জীবন লাভ করে, দালালরা বিকশিত হয় এবং চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা লাভবান হয়। যুক্তি দিয়ে দেখাব যে শরীর থেকে অঙ্গ নিতে তাঁদের ওপর নিয়মিতভাবে গুরুতর বায়োভায়োলেন্স চালানো হয়, যদিও ব্যক্তিস্বার্থের সুরক্ষা দিতে এসব ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন করা হয় এবং ব্যক্তিগত নৈতিকতা দিয়ে তা জায়েজ করা হয়।

বায়োভায়োলেন্সের ভুলভুলাইয়া

৩৩ জন বাংলাদেশি কিডনি বিক্রেতা, যাঁদের সকলেই গরিব, অঙ্গ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাঁদের ওপর চালানো জৈব সন্ত্রাস নথিবদ্ধ করেছেন। এই ধারাবাহিক নৃকুলবিদ্যায় তাঁরা কিডনি পণ্যায়নের প্রক্রিয়া ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন, যে প্রক্রিয়া ও অভিজ্ঞতার কারণে পরবর্তীতে তাঁরা নিদারুণ ভোগান্তির শিকার হয়েছেন। এই অংশে আমি কিডনি বিক্রির বিভিন্ন পর্যায় উন্মোচন করব– কিভাবে বিক্রেতারা ফাঁদে পড়েন, দালালের সাথে দেখা করেন, নকল পাসপোর্ট পান, অস্ত্রোপচারের জন্য বিদেশ যান এবং চিরস্থায়ী ক্ষত ও চরম ভোগান্তি সাথে নিয়ে বাংলাদেশে ফেরত আসেন।

এখানে আলোচনা করা হবে কিডনি বিক্রেতার বিরুদ্ধে এই বায়োভায়োলেন্সকে কিভাবে ব্যক্তিক ও প্রাসঙ্গিক চেহারা দেওয়া হচ্ছে। তাঁদের কিডনি বিক্রির দীর্ঘ অভিযান বা অভিজ্ঞতাকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায় : অপারেশন-পূর্ববর্তী আশা, অপারেশনকালীন কোরবানি এবং অপারেশন-পরবর্তী কষ্ট ও ভোগান্তি।

নতুন জীবনের আশা: অপারেশনের আগে

দারিদ্র্যের কারণেই আমার গবেষণায় অংশগ্রহণকারীরা শরীরের অঙ্গ বিক্রি করতে বাধ্য হন। যখন এই দরিদ্র জনগোষ্ঠী খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কিডনি বিক্রির ব্যাপারে জানতে পারেন, তখন তাঁরা কিডনি 'দান' করার ব্যাপারে প্রলুব্ধ হন। তার কারণ কিডনি 'দান'-এর বিনিময় হিসেবে বেশ লোভনীয় প্রস্তাব (যেমন–অর্থনৈতিক পুরস্কার, চাকরির প্রস্তাব কিংবা বিদেশি ভিসা) দেওয়া হয়। কিডনি কেনার যে ১২৮৮টি শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন আমি সংগ্রহ করেছি, তার একটি উদাহরণ হিসেবে দেওয়া হলো। এই বিজ্ঞাপনে সম্ভাব্য কিডনি গ্রহীতা সম্ভবত মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়েছেন, কেননা তাঁর পক্ষে কিডনি বিক্রেতার জন্য বিদেশি ভিসা নিশ্চিত করতে পারার কথা নয়।[২]

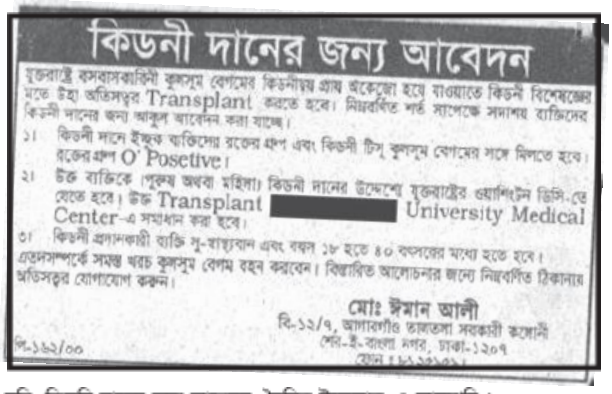

কিডনী দানের জন্য আবেদন

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারিনী কুলসুম বেগমের কিডনীদ্বয় প্রায় অকেজো হয়ে যাওয়াতে কিডনী বিশেষজ্ঞের মতে উহা অতিসত্বর Transplant করতে হবে। নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে সদাশয় ব্যক্তিদের কিডনী দানের জন্য আকুল আবেদন করা যাচ্ছে।

১। কিডনী দানে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের রক্তের গ্রুপ এবং কিডনী টিসু কুলসুম বেগমের সঙ্গে মিলতে হবে। রক্তের গ্রুপ O' Posetive।

২। উক্ত ব্যক্তিকে (পুরুষ অথবা মহিলা) কিডনী দানের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসি-তে যেতে হবে। উক্ত Transplant [redacted] University Medical Center-এ সমাধান করা হবে।

৩। কিডনী প্রদানকারী ব্যক্তি সু-স্বাস্থ্যবান এবং বয়স ১৮ হতে ৪০ বৎসরের মধ্যে হতে হবে।

এতদসম্পর্কে সমস্ত খরচ কুলসুম বেগম বহন করবেন। বিস্তারিত আলোচনার জন্যে নিম্নবর্ণিত ঠিকানায় অতিসত্বর যোগাযোগ করুন।

মোঃ ঈমান আলী
বি-১২/৭, আগারগাঁও তালতলা সরকারী কলোনী
শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

পি-১৬২/০০

ছবি: কিডনি দানের জন্য আবেদন, দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ জানুয়ারি ২০০০

সাক্ষাৎকার দেওয়া বিক্রেতারা শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে খুব কমই ধারণা রাখেন। যেমন–৪৩ বছর বয়স্ক চা দোকান মালিক এবং কিডনি বিক্রেতা মফিজ বলেছিলেন: '২০০০ সালে ইত্তেফাক পত্রিকায় কিডনি চাইয়া ছাপানো একটা বিজ্ঞাপন আমার চোখে পড়ে। এক বন্ধুরে আমি জিজ্ঞাস করি, কিডনি জিনিসটা কী? এইডা কোথায় থাহে? এইডা নষ্ট হইলে কী কইরতে হয়? কিডনি ক্যামনে দান করতে হয়? এইডা দিলে আমি কত টাকা পামু? আমি তো জানতামই না যে টাকার বিনিময়ে কিডনি বেচা যায়।' সব কিডনি বিক্রেতাই মনে করেন, বিক্রির পর তাঁদের ভাগ্যের চাকা ঘুরে যাবে, আবার একই সাথে সার্জারি-পরবর্তী ফলাফল নিয়ে তাঁরা শঙ্কায় থাকেন। বিক্রেতারা অবশেষে এই আশা আর শঙ্কার মাঝে জুয়া খেলতে শুরু করেন। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে আগ্রহী হয়ে বিক্রেতা সম্ভাব্য ক্রেতাদের সাথে যোগাযোগ করেন।[৩]

এই সম্ভাব্য ক্রেতারা হয় কিডনি গ্রহীতা অথবা দালাল। এই বিক্রেতারা আমাকে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় বলেছেন যে কিডনি গ্রহীতা কিডনি 'দান' করাকে একটি মহৎ কাজ হিসেবে তাঁদের কাছে উপস্থাপন করে, যার মাধ্যমে মানুষের জীবন বাঁচে কিন্তু দানকারীর শরীরের কোনো ক্ষতি হয় না। অস্ত্রোপচারের সমস্ত খরচ বহন করা ছাড়াও বিক্রেতাকে মোটা অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দেয়। সাক্ষাৎকারে বেশির ভাগ বিক্রেতাই বলেছেন, দালালরা তাঁদের একটি 'ঘুমিয়ে থাকা' কিডনি 'দান' করার ব্যাপারে ক্রমাগত উৎসাহিত করতে থাকে।[৪] 'ঘুমিয়ে থাকা' কিডনির গল্পটা অনেকটা এ রকম: মানুষের দুটি কিডনির মধ্যে একটা কাজ করে, আরেকটা 'ঘুমিয়ে' থাকে। প্রথম কিডনিটা সংক্রমিত হলেই ঘুমিয়ে থাকা কিডনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ শুরু করে। কিন্তু প্রথম কিডনিটা অকেজো/নষ্ট হয়ে গেলে দূষিত রক্তের প্রভাবে দ্বিতীয় কিডনিও অকেজো/নষ্ট হয়ে যায়। তাই একটি কিডনি নিয়ে যে কেউই সুস্থ-সবলভাবে বেঁচে থাকতে পারে। অপারেশনের সময় ডাক্তার প্রথমে ঘুমিয়ে থাকা কিডনিটাকে ওষুধের সাহায্যে জাগিয়ে তোলেন। এই নতুন 'জেগে ওঠা' কিডনিটা কিডনিদাতার শরীরেই থাকে, আর 'পুরনো' কিডনি সরিয়ে ক্রেতার শরীরে বসানো হয়। এভাবে কিডনি বিক্রিকে দুই পক্ষের জন্যই ভালো একটি কাজ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। এই 'ঘুমিয়ে থাকা' কিডনির গল্প বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত, এবং এর মাধ্যমে আমরা অনুধাবন করতে পারি যে বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সাথে কেমন ধূর্ত প্রতারণা করা হয়। এ ধরনের প্রতারণা শরীর থেকে অঙ্গ কেটে নেওয়ার জন্য পরিচালিত জৈব সন্ত্রাসের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

রাজি হওয়ার পর বিক্রেতার সাথে ক্রেতার রক্তের গ্রুপ এবং টিস্যু টাইপিং মিলিয়ে নেওয়া হয়। টিস্যু মেলানোর কাজটি খুবই কঠিন, আর কঠিন বলেই এ ধরনের কাজে দালালের এত দরকার। টিস্যু মিলে গেলে এবং বিক্রেতার শারীরিক সক্ষমতা প্রমাণিত হলে ক্রেতারা টাকা-পয়সা নিয়ে দরদাম শুরু করে। প্রাথমিকভাবে তারা বিক্রেতাকে একটি কিডনির বিনিময়ে মাত্র ৮০ হাজার টাকা (১১৫০ ডলার) দেওয়ার প্রস্তাব করে। বলা হয়, বিক্রেতার রক্তের ধরনের কিডনি বাজারে বেশ সহজলভ্য, তাই দাম কম। আরো দরদামের পর ক্রেতা শেষ পর্যন্ত এক লাখ টাকা (১৪০০ ডলার) দিতে রাজি হয়। যা হোক, তারা এই বলে বিক্রেতাকে সতর্ক করে দেয় যে পুরো টাকাটা অপারেশন থিয়েটারে ঢোকার ঠিক আগমুহূর্তে দেওয়া হবে, কারণ কিডনি দেওয়ার আগেই টাকা দিয়ে দিলে বিক্রেতা টাকা নিয়ে পালিয়ে যেতে পারে।

অনেক বিক্রেতাই এই টাকায় সন্তুষ্ট হন না; ক্রেতারা তাঁদের চাকরির প্রস্তাব দেয়, বিদেশি ভিসা এবং নাগরিকত্ব আর জমি দেওয়ার লোভ দেখায়। সব বিক্রেতাই ভীতসন্ত্রস্ত থাকেন, ক্রেতারা এই বলে তাঁদের শতভাগ সফল অপারেশনের নিশ্চয়তা দেয় যে পৃথিবীর সেরা সার্জনরাই তাঁদের অপারেশন করবেন। ক্রেতারা আরো বলে, কিডনি বিক্রি করতে দেশের বাইরে (বিশেষ করে ভারতে, যেখানে বেশির ভাগ বাংলাদেশি বিক্রেতাই অপারেশন করিয়ে থাকেন) যাওয়া হচ্ছে আনন্দ ভ্রমণের/বেড়াতে যাওয়ার মতো, কারণ বিক্রেতারা নতুন নতুন জায়গায় বেড়াবেন, বাইরে খাওয়া-দাওয়া করবেন এবং ভারতীয় সিনেমা দেখবেন। এভাবেই ক্রেতারা সম্ভাব্য বিক্রেতাদের প্রতারণা ও মিথ্যা আশ্বাসের মাধ্যমে প্রলুব্ধ করে, যা বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বাজারে পরিচালিত জৈবসন্ত্রাসের বহুল ব্যবহৃত উপাদান।

দালাল কিডনি বিক্রেতার জন্য ভুয়া পাসপোর্ট এবং নকল কাগজপত্রের ব্যবস্থা করে, যেন প্রমাণ করা যায় যে এই বিক্রেতা তাঁর আত্মীয়ের জন্য নিজের একটি কিডনি দান করছেন এবং বিক্রেতাকে উপদেশ দেয়, যেন তাঁর সত্যিকারের পরিচয় ভারতীয় স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের কাছে প্রকাশ না করেন; কারণ তাহলে পুরো ব্যাপারটাই বাতিল হয়ে যাবে।[৫] নতুন এই আত্মীয় পরিচয় প্রতিষ্ঠা করতে ৩৮ বছর বয়স্ক একজন হিন্দু বিক্রেতা হিরুকে 'সুন্নত/মুসলমানি' (লিঙ্গচর্মচ্ছেদ) করতে হয়, কারণ তাঁর কিডনির ক্রেতা একজন মুসলিম। হিরু 'সুন্নত' করাতে রাজি হন; কারণ তাঁর মনে হয়েছিল, এই কিডনি বিক্রির মাধ্যমে তিনি তাঁর সামাজিক অবস্থান পরিবর্তন করতে পারবেন।

"ভারতে যাওনের আগে আমার কিডনির খদ্দের কইল, 'আমরা ভারতে যাইতেছি ভাই হিসাবে।' সে আরো কইল, 'কিন্তু ভাই, তুমি তো হিন্দু আর আমি একজন মুসলমান। যেহেতু অপারেশনের সময় তুমি পুরা ন্যাংটা থাকবা, ডাক্তার আমাগো আসল পরিচয় জানতে পারব, সেহেতু আমরা আমাগো কাজটা শেষ করতে পারব না। ডাক্তার বুঝতে পারব যে আমার মুসলমানি করানো হইছে, কিন্তু তোমারে করানো হয় নাই।' তারপর সে আমার সোনার মাথা (লিঙ্গের উপরিভাগ) থেইকা চামড়া ফেইলা দেওয়ার

কথা বলে, যেইডা হের মতে একমাত্র উপায়। কী ভয়ংকর বিপদের কথা! এইটা থেইকা আমি আর পিছাইতেও পারি না, আবার এইডা করতে আমার ধর্ম আমারে সায় দেয় না। মনে বহুত কষ্ট নিয়া তারে ঢাকায় মুসলমানির আয়োজন করতে কইলাম, কিন্তু সে আমারে করতে কইল আমার গ্রামে। পরের দিন সকালে আমি ডাক্তারের কাছে গেলাম, কিন্তু টাকার লাইগা শেষ পর্যন্ত কাজটা গ্রামের এক হাজামের কাছেই করতে হইল। হাজাম কইল, মুসলমানি করানো খুবই সহজ কাজ। হে আমার সোনার মাথার চামড়ায় একটা ইনজেকশন (লোকাল অ্যানেসথেসিয়া) দিল। চামড়ার চারপাশে ঘষল আর জিগাইল কোনো ব্যথা আছে কি না। আমারে ছাদের দিকে তাকাইতে কইল আর তাড়াতাড়ি কামডা শেষ করল। আমি কোনো ব্যথা পাইলাম না, তাই আমি বাজারে গেলাম আর যে কিডনি নিব, তার লগে দেখা করলাম। হে মনে হয় হাঁফ ছাইড়া বাঁচল। যখন ঘরে ফিরা আসতেছিলাম, ততক্ষণে হাজামের ওষুধের আয়ু শেষ, মনে হইতেছিল আমি একটা ভয়ংকর খারাপ খোয়াব দেখতেছি।"

কিডনি দেওয়ার পর হিরু খুবই চিন্তিত ছিলেন এই ভেবে যে ঈশ্বর তাঁর এই অবিবেচক কাজের ক্ষমা হয়তো কখনও করবেন না, আর একই সাথে তাঁর শরীর কখনও আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেবেন না। হিরুর এই কাহিনীটাই সাক্ষ্য দেয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রেতারা কেমন করে যে কোনো মূল্যে, এমনকি বিক্রেতার ধর্মীয় বিশ্বাসকে পদদলিত করে হলেও জৈব সন্ত্রাস চালায়।

বিচ্ছিন্নকরণ, বিসর্জন ও অঙ্গচ্ছেদ: অপারেশন পর্যায়

ভারতীয় সীমান্ত পার হওয়ার পর কিডিন ক্রেতারা বিক্রেতার পাসপোর্ট কেড়ে নেয়, যেন কিডনি কেটে নেওয়ার আগে কোনোভাবেই তিনি দেশে ফিরতে না পারেন। ক্রেতার নির্দেশমতো বিক্রেতা দালালের ভাড়া করা একটি ছোট্ট ঘরে অমানবিকভাবে থাকেন। বরাবরের জন্য ভাড়া করা এই ঘরে তাঁর মতো আরো দশজন বিক্রেতা একই সাথে অবস্থান করেন। সব মেডিক্যাল পরীক্ষা পুনরায় করতে হয়, কারণ ভারতীয় ডাক্তাররা বাংলাদেশে করা পরীক্ষাগুলোর স্বীকৃতি দেয় না। এই বিক্রেতারা যেহেতু দেশের বাইরে যেতে খুব একটা অভ্যস্ত নন, তাই তাঁরা এ অবস্থায় নিজেদের বিচ্ছিন্ন মনে করতে শুরু করেন। এই বায়োভায়োলেন্সে ক্রেতারা ক্রমেই নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে থাকে, আর বিক্রেতারা ক্রমেই নিষ্ক্রিয় হতে থাকেন।

'আমরা এখন জিন্দা লাশ। কিডনি বেচার কারণে আমাগো শরীর হালকা হইছে আর আমাগো বুক হইছে ভারী।'

যদি কোনো বিক্রেতা এই বায়োভায়োলেন্সের মোকাবিলা করেন, তাঁকে এই ব্যবসা থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। তার পরও কিছু বিক্রেতা তাঁদের নিজেদের পাওনা বাড়ানোর দাবি করেন, যখন তাঁরা দেখেন যে দালালরা প্রতি কিডনির বিনিময়ে প্রায় চার লাখ টাকা (প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ডলার) লাভ করে। দালালরা তখন বিক্রেতাকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে এই ব্যবসায় অনেক খরচ এবং একই সাথে অনেক ঝুঁকি জড়িত। একবার সদরুল নামের একজন কলেজপড়ুয়া ছাত্র তার কিডনি 'দান' না করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য তার পাসপোর্ট ফেরত চায়। দালাল এবং তার ভাড়া করা দুজন মাস্তান সদরুলকে নির্দয়ভাবে প্রহার করে এবং হুমকির মুখে তার অপারেশন সম্পন্ন করে। এই ঘটনাটি কিডনি বিক্রেতাদের ওপর বল প্রয়োগের একটি নমুনা, যা বায়োভায়োলেন্সের আরেকটি প্রমাণ।

অপারেশনের আগের দিন বিক্রেতারা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পাওনা চাইলে ক্রেতারা এক্ষেত্রেও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং বাংলাদেশে না ফেরা পর্যন্ত পাওনা পরিশোধ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। বিক্রেতা ক্রমাগত ভাবতে থাকেন– এর পরে কী হবে? যদি আমি অপারেশন থিয়েটারে মারা যাই, তাহলে কী হবে? বিক্রেতা বুঝতে পারেন, খরচ বাঁচাতে ক্রেতা তাঁর মরদেহও দেশে পাঠাবে না। কোনো কিছু না জানার কারণে তাঁদের পরিবারও তা ফিরিয়ে নিতে পারবে না। ক্রেতার হাতে আটক একজন বন্দির মতোই বিক্রেতা অপারেশন রুমে প্রবেশ করেন।

সার্জারির পর বিক্রেতা প্রথম যা দেখতে পান তা হলো, তাঁর শরীরে প্রায় ২০ ইঞ্চি গভীর একটি ক্ষত। বিক্রেতার জানার কথা নয়, মাত্র ২০০ ডলার বেশি পারিশ্রমিক পেলেই হয়তো সার্জন ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারি করতে পারত, যাতে তাঁর ক্ষতটি হতো মাত্র চার ইঞ্চি। এ ধরনের অতি ঝুঁকিপূর্ণ অপারেশনের পরও শুধুমাত্র খরচ বাঁচাতে বিক্রেতাকে মাত্র পাঁচ দিনের মধ্যেই হাসপাতাল থেকে রিলিজ করা হয়। জৈব সন্ত্রাসের চিরস্থায়ী ক্ষত নিজের শরীরে নিয়ে বিক্রেতা ক্রেতার সেই অপরিচ্ছন্ন, নোংরা ঘরে ফিরে আসেন।

অপারেশনের পর ভারতে থাকা বিক্রেতার জন্য এতই অসুবিধাজনক হয়ে ওঠে যে প্রায় প্রত্যেক বিক্রেতাই কয়েক দিনের মধ্যেই দেশে ফিরতে বাধ্য হন, যদিও ডাক্তারের পরামর্শ থাকে আরো কয়েক সপ্তাহ বেশি থাকার। অপারেশনের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ট্রেনযাত্রায় অনেক বিক্রেতার ক্ষত থেকে রক্তপাত হতে শুরু করে। ২৮ বছর বয়সী একজন কিডনি বিক্রেতা মালেক কিডনির ক্ষত থেকে রক্তপাতের কারণে কলকাতায় ডাক্তার দেখান, খরচের কারণে তাঁর পক্ষে সেখানে থাকা সম্ভব হয়নি। সীমান্ত পার হয়ে বাংলাদেশে ঢোকার পর তাঁরা জৈব সন্ত্রাসের চূড়ান্ত ফসলস্বরূপ পাওয়া নতুন ক্ষতিগ্রস্ত শরীরটি নিয়ে সেই পুরনো জীবনে প্রবেশ করেন।

ভাঙা স্বপ্ন আর দুর্দশা: অপারেশন-পরবর্তী জীবন

ঘরে ফিরে আসার পর বিক্রেতাকে তাঁর অনুপস্থিতির কারণ ব্যাখ্যা করা এবং ক্ষত লুকানোর ব্যাপারে অবিরত মানসিক চাপের মধ্যে থাকতে হয়।[৬] কোনোভাবে ক্ষত প্রকাশিত হয়ে গেলে দূরের কোনো জায়গায় কাজের সময় দুর্ঘটনায় এই ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে– এমন এক কাল্পনিক কাহিনী ফাঁদেন বিক্রেতা। তার পরও অনেক বিক্রেতা তাঁদের এই করুণ কাহিনী লুকাতে ব্যর্থ হন, তাঁদের এই 'কলঙ্ক' সবার কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং তাঁরা 'কিডনি মানব' নামে পরিচিতি পান। কিছু কিছু বিক্রেতা বাকি জীবনে আর বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নেন। সর্বোপরি কিডনি বিক্রয়-পরবর্তী জীবনে বিক্রেতার শরীর ভয়ংকরভাবে ভেঙে পড়ে। তাঁরা নানা রকম শারীরিক ও মানসিক দুর্দশার সম্মুখীন হন। তাঁরা নিজেদের বিকলাঙ্গ হিসেবে ভাবতে থাকেন। আর কোনো বিক্রেতার পক্ষেই ১৫০০ টাকা (২২ ডলার) খরচ করে বাৎসরিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো সম্ভব হয় না। এই বায়োভায়োলেন্সের ফলাফল মারাত্মক। তাছাড়া বেশির ভাগ বিক্রেতাই (৩৩ জনের মধ্যে ২৭ জনই) প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কিডনি বিক্রির অর্থ বুঝে পান না। বাড়ি ফেরার পর বিক্রেতাকে টাকার জন্য বারবার ক্রেতার কাছে যেতে হয়। ক্রেতা হয়তো একেকবার তাঁকে কিছু টাকা দেন এবং তা হতে অনুল্লিখিত খরচ কেটে রাখেন। এর ফলে বিক্রেতা যে টাকাই পান না কেন, তা লাভজনকভাবে ব্যবহার করতে পারেন না। প্রায় ক্ষেত্রেই ধার শোধ করতে, ব্যবসায় খাটাতে, চাকরির জন্য ঘুষ কিংবা যৌতুক দিতে গিয়ে টাকাটা খরচ হয়ে যায়। কিছু বিক্রেতা টেলিভিশন, মোবাইল ফোন কিংবা সোনার চেইনের মতো জিনিস কিনতে এই টাকা ব্যবহার করেন। সাক্ষাৎকারদাতাদের মধ্যে মাত্র দুজন বিক্রেতা–আবুল (৩২) ও রহমত (২৮) এই কিডনি বিক্রির টাকা দিয়ে গরুর খামার ও জমি কিনে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়েছেন। অন্যরা কেউই দারিদ্র্যের কশাঘাত থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি, বরং সত্যিকার অর্থে আগের তুলনায় মানবেতরভাবেই জীবন কাটাচ্ছেন। যেমন, ৩০ বছর বয়সী কিডনি বিক্রেতা আবদুল বলেন, 'আমার কিডনি ও কাম দুইডাই শ্যাষ। এহন রিকশা টানা, ক্ষেতের কাম কিংবা কারখানার ভারী কাম–কোনডাই আমি করতে পারি না। এইডা কেমন জীবন! যদি গতরে বল থাকত, তয় যে কোনো কামই আমি করতে পারতাম আর

কিডনি বেইচ্যা যেই সামাইন্য কয়ডা টাহা পাইছি, তা-ও তো কামাইতে পারতাম।' শেষ পর্যন্ত কিডনি বিক্রেতা এই করুণ সত্যিটা উপলব্ধি করতে পারেন যে তিনি একটি 'সোনার হরিণ'-এর পেছনে ছুটছেন, যার দেখা কখনোই পাবেন না তিনি।

আমার নৃতত্ত্ববিদ্যা কিডনি বিক্রেতাদের ওপর আরোপিত বায়োভায়োলেন্সের ধাঁধার জট খুলেছে। স্বল্পমেয়াদি আর্থিক লাভের বিপরীতে দীর্ঘমেয়াদি শারীরিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতি এই সত্যই উন্মোচন করে যে এই বায়োভায়োলেন্স বিক্রেতার জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। যেমন: ২৫ বছর বয়সী কিডনি বিক্রেতা কেরামত অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে বলেছেন, 'আমরা এখন জিন্দা লাশ। কিডনি বেচার কারণে আমাগো শরীর হালকা হইছে আর আমাগো বুক হইছে ভারী।'

না-বলা গল্প: বায়োভায়োলেন্সের জৈব সামাজিক প্রভাব

কিডনি বিক্রেতাদের ওপর সচেতনভাবে যে বায়োভায়োলেন্স চালানো হচ্ছে তা মারাত্মক ভয়াবহ। যদিও বিভিন্ন মেডিক্যাল স্টাডি দাবি করে যে অপারেশনের সময় কিডনি দানকারীর মারা যাওয়ার আশঙ্কা প্রতি তিন হাজারে মাত্র একজন (ব্রুজোন ও বারলোকো, ২০০৭), এবং কিডনিদাতারা কেবল দীর্ঘ মেয়াদে বিভিন্ন দীর্ঘস্থায়ী রোগ (যেমন–হেপাটাইটিস, রক্তক্ষরণ ও উচ্চ রক্তচাপ) এবং ভাইরাসজনিত অসুখে (যেমন–এইচআইভি/এইডস, মেলিগন্যান্সি ও ইনফেকশন) আক্রান্ত হওয়ার উচ্চ ঝুঁকিতে থাকেন (চ্যাপম্যান, ২০০৮: ১৩৪৩; দানোভিচ, ২০০৮: ১৩৬১; নাকভি, ২০০৮: ১৪৪৪), আমার নৃতাত্ত্বিক এবং অন্যান্য গবেষণা এটাই প্রমাণ করে যে কিডনি বিক্রির পর থেকেই বিক্রেতাদের স্বাস্থ্য ক্রমাগত খারাপ হয়েছে, অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি হয়েছে এবং তাঁদের সামাজিক অবস্থান মারাত্মকভাবে নেমে গেছে। তার ওপর বাংলাদেশের কিডনি বিক্রেতাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, কিডনি বিক্রির ঘটনা তাঁদের মানসিক ও মনঃসামাজিক অবস্থার ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, বিশেষত আত্মসত্তার নিরিখে প্রভাবটি মারাত্মক।

ক্ষতিগ্রস্ত সত্তা: আত্মার দেহ হারানোর যন্ত্রণা

বাংলাদেশি কিডনি বিক্রেতাদের আখ্যান থেকে স্পষ্ট, কিডনি ছাড়া বেঁচে থাকা শুধুমাত্র একটি শারীরিক পরিবর্তন নয়, এটি আত্মার দেহ হারানো এবং ব্যক্তির নিজস্ব অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলার মতো ব্যাপার। আমার সাক্ষাৎকার নেওয়া অনেক বিক্রেতাই মনে করেন, কিডনির কেনাবেচা শরীর ও মনের ভারসাম্য বিপন্ন করে তোলে। অঙ্গচ্ছেদ-পরবর্তীকালে তাঁরা উপলব্ধি করেন, পুরনো শরীরের সাথে নতুন শরীরের বিরোধ। তাঁরা উপলব্ধি করেন, যেন একটিমাত্র অঙ্গের অনুপস্থিতি তাঁদের পুরো শরীরকে বিদীর্ণ করে দিয়েছে। ফলে কোনো কোনো বিক্রেতার কাছে মনে হয়েছে, তাঁরা 'অর্ধমানব'-এ পরিণত হয়েছেন এবং তাঁদের আত্মসত্তা এলোমেলো হয়ে গেছে।

বাংলাদেশি কিডনি বিক্রেতারা অনুভব করেন, তাঁরা যেন এক অস্তিত্বহীনতার মধ্যে বেঁচে আছেন। ক্ষত চোখে পড়লে মুহূর্তের মধ্যে তাঁরা যেন অপারেশনের সময়ে ফিরে যান। বেশির ভাগ বিক্রেতা প্রতিবছর তীব্র যন্ত্রণা নিয়ে সেই অপারেশনের দিনটিকে 'মরণের দিন' হিসেবেই স্মরণ করেন। প্রতিদিন তাঁদের মনে হয়, তাঁরা শিগগিরই মরে যাবেন, কারণ তাঁদের কিডনি মাত্র একটি। মফিজ প্রায়ই কোরআনের একটি আয়াত পাঠ করেন, যা মুসলমানরা মৃত্যু সংবাদ শুনলেই পাঠ করে থাকেন–'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন (আমরা স্রষ্টার কাছ থেকে এসেছি আবার স্রষ্টার কাছেই ফিরে যাব)। প্রত্যেক বিক্রেতা তাঁর ক্রেতার সাথে এক অভিন্ন আত্মা হিসেবেই নিজেদের উপলব্ধি করেন।

রক্ত আর মাংস ভাগাভাগি করে নেওয়ার ফলে বিক্রেতা ও গ্রহীতা একই শরীর, একই ব্যক্তি এবং একই অস্তিত্বে পরিণত হয়। কিডনি গ্রহীতার মৃত্যুর ফলে কোনো কোনো বিক্রেতার অদ্ভুত অনুভূতি হয়। তাঁরা বুঝে উঠতে পারেন না, নিজেরা বেঁচে থাকার পরও কেমন করে তাঁদের শরীরের একটি অঙ্গ মরে যেতে পারে। নিজের অস্তিত্ব নিয়ে এই ধাঁধা এক বিপর্যস্ত সত্তার জন্ম দেয়। তার ওপর নিজের শরীরের অঙ্গ বিক্রি করার কারণে বেশির ভাগ বাংলাদেশি কিডনি বিক্রেতা নিজেদের বিদেহী আত্মারূপে অনুভব করতে থাকেন। অঙ্গহানির এই ঘটনা তাঁদের দীর্ঘদিনের সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় সংস্কার, যেমন–শরীরের মালিকানা, শরীরের বিশুদ্ধতা, শরীরের মর্যাদা ইত্যাদির ওপর আঘাত করে। উদাহরণস্বরূপ, আমাকে সাক্ষাৎকার দেওয়া অনেক বিক্রেতাই মরণের পর স্রষ্টার কাছে তাঁর দেওয়া পুরো শরীর নিয়ে ফিরে যেতে না পারার ভয় ও শূন্যতা অনুভব করেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন, স্রষ্টা তাঁদের শরীরের মালিক এবং তাঁর এই উপহার বিক্রি করে দিয়ে তাঁরা অপরাধ
করেছেন। এছাড়া অনেক বিক্রেতা বলেছেন, অঙ্গ কেনাবেচা মানুষের পক্ষে সবচেয়ে মর্যাদাহানিকর কাজ, কিডনি বিক্রির পর তাঁরা তাঁদের আত্মসম্মান, স্বকীয়তা ও নৈতিক মূল্যবোধ হারিয়েছেন এবং নিজেদেরকে 'মানবেতর' হিসেবে বিবেচনা করছেন।

এই দেহ হারিয়ে বিদেহী হওয়া এবং নিজের অস্তিত্ব নিয়ে যন্ত্রণার ফলে বাংলাদেশি কিডনি বিক্রেতাদের আত্মসত্তা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমাকে সাক্ষাৎকার দেওয়া বিক্রেতাদের মধ্যে দেখেছি পরিবার, বন্ধু ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রবণতা। তাঁরা ভয়ংকর বিষণ্ণতা, মর্মপীড়া, হতাশায় ভোগেন এবং থেকে থেকে কান্নায় ভেঙে পড়েন। কিডনি বিক্রেতা মফিজ বলেছেন, তিনি প্রায়ই অন্ধকারে চুপচাপ বসে থাকেন এবং আত্মহত্যা করার কথা ভাবেন (মোয়াযাম এবং অন্যান্য, ২০০৯: ৩৩; জারগুশি, ২০০১ ক: ১৭৯৬)।

কিডনি ছাড়া বেঁচে থাকা শুধুমাত্র একটি শারীরিক পরিবর্তন নয়, এটি আত্মার দেহ হারানো এবং ব্যক্তির নিজস্ব অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলার মতো ব্যাপার।

কিডনি বিক্রির দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব : সামাজিক ও দৈহিক প্রেক্ষিত

বাংলাদেশে যাঁরা কিডনি বিক্রি করছেন, তাঁরা দৈহিক সমস্যার পাশাপাশি প্রকট সামাজিক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছেন। সমাজে অঙ্গ বিক্রির ধারণার সাথে চরম লজ্জাকর অসহায়ত্বের যোগসূত্র থাকায় কিডনি বিক্রির পর বিক্রেতারা এ ঘটনা লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে শতকরা ৭৯ জন বিক্রেতা সমাজবিচ্যুত হয়ে পড়েন। একইভাবে পাকিস্তানি বিক্রেতারাও মনে করেন যে নিজ অঙ্গ বিক্রি করে দেওয়া চরম অবমাননাকর। তাঁদের কাছে সমাজে নিজেদের নিতান্তই হাস্যরসের খোরাক বলে মনে হয়। (মোয়াযাম এবং অন্যান্য, ২০০৯: ৩৫), মলদোভা ও ফিলিপাইনের বিক্রেতারা তাঁদের সহকর্মী ও প্রেমিকার কাছে 'দুর্বল' ও 'অক্ষম' বলে পরিচিতি পান। অবিবাহিতরা বিয়ে করতে পারেন না। কারণ সমাজে এই ধারণা প্রচলিত আছে যে যাদের একটি কিডনি থাকে, তারা পরিবার চালাতে অসমর্থ (শেপার-হিউ, ২০০৩: ২২০)। ইরানেও দেখা গেছে, কিডনি বিক্রির পর ৭৩ শতাংশ পরিবারে কলহ শুরু হয়েছে এবং ২১ শতাংশ কিডনি বিক্রেতার বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে (জারগুশি, ২০০১ ক: ১৭৯০)।

কিডনি বিক্রির পর বিক্রেতার জীবনে চরম আর্থিক দুর্দশা নেমে আসে। বাংলাদেশি কিডনি বিক্রেতাদের শতকরা ৭৮ জনের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটেছে; বহুজন কর্ম হারিয়ে বেকার জীবন যাপন করছেন। যাঁরা কাজ করছেন, তাঁরাও কেবল একটি কিডনি নিয়ে শারীরিক দুর্বলতার কারণে পুরো সময় কাজ করতে পারছেন না। ফলশ্রুতিতে কিছু বাংলাদেশি বিক্রেতা (১৫ শতাংশ) ইতিমধ্যেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বেচাকেনার দালাল হিসেবে কাজ করা শুরু করেছেন। একইভাবে ভারতে কিডনি বিক্রেতাদের

ক্ষেত্রে মাসিক উপার্জন এক-তৃতীয়াংশ কমে গেছে এবং তাঁদের মধ্যে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা বেড়ে গেছে (গয়াল ও অন্যান্য, ২০০২: ১৫৮৯-১৫৯১)। আরেকটি গবেষণা থেকে জানা যায় যে ভারতে বেশির ভাগ কিডনি বিক্রেতাই ঋণের টাকা পরিশোধে কিডনি বিক্রি করেছিলেন, কিন্তু অপারেশনের পর তাঁরা নতুন করে ঋণের বোঝায় চাপা পড়েছেন (কোহেন, ১৯৯৯: ১৫২)। পাকিস্তানে ৮৮ শতাংশ বিক্রেতা বলেছেন যে কিডনি বিক্রি তাঁদের জীবনে কোনো অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন নিয়ে আসেনি (নাকভি ও অন্যান্য, ২০০৭:৯৩৪; আরো দেখুন মোয়াযাম ও অন্যান্য, ২০০৯: ৩৩)। মলদোভা ও ফিলিপাইনের বিক্রেতারাও গ্রামে ফিরে গিয়ে বেকারত্বের ভাগ্য বরণ করেছেন (শেপার-হিউ, ২০০৩ক:২২০)। অন্যদিকে ৮১ শতাংশ মিসরীয় কিডনি বিক্রির পাঁচ মাসের মধ্যে জীবনমান উন্নয়নে টাকা খরচের বদলে ঋণ পরিশোধেই পুরো টাকা

খরচ করে ফেলেছেন (বুদিয়ানি-সাবেরি ও দেলমোনিকো, ২০০৮: ৯২৭)। কিডনি বিক্রেতাদের মধ্যে যাঁদের জীবন পর্যালোচনা করা হয়েছে, তাঁদের ৬৫ শতাংশই অপারেশনের পর জীবিকা উপার্জনে বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। তাঁদের মাসিক আয় ২০ থেকে ৬৬ শতাংশ পর্যন্ত কমে গেছে বলে জানা যায় (জারগুশি, ২০০১ক: ১৭৯০)।

কিডনি বিক্রির বহুবিধ স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি রয়েছে। এতে বিক্রেতার শারীরিক সক্ষমতা হ্রাস পায়। ৩৩ শতাংশ বাংলাদেশি কিডনি বিক্রেতা ব্যথা, যন্ত্রণা, দুর্বলতা, ওজন কমে যাওয়া এবং নিয়মিত অসুস্থতার সম্মুখীন হন। একইভাবে ভারতে ৩০৫ জন বিক্রেতার ৫০ শতাংশই অপারেশনের জায়গায় ব্যথা অনুভব করেন এবং ৩৩ শতাংশ বিক্রেতা দীর্ঘমেয়াদি ব্যথায় ভুগছেন বলে অভিযোগ করেন (গয়াল ও অন্যান্য, ২০০২: ১৫৮৯)। পাকিস্তানে ৩২ জন কিডনি বিক্রেতার ওপর পর্যবেক্ষণ চালিয়ে দেখা গেছে, তাঁরা ক্লান্তি, ঝিমুনিভাব ও শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত সমস্যায় ভুগছেন, তিনজন উচ্চ রক্তচাপ এবং প্রস্রাবকালীন রক্ত বা প্রোটিন নিঃসরণজনিত সমস্যায় ভুগছেন (মোয়াযাম ও অন্যান্য, ২০০৯: ৩৩-৩৪)। আরেকটি গবেষণায় জানা গেছে, ২৩৯ জন বিক্রেতা দুর্বলতা, জ্বর, অ্যাসিডিটি এবং ক্ষুধামান্দ্যের অভিযোগ করেছেন (নাকভি ও অন্যান্য, ২০০৮: ১৪৪৬)। ইরানে ৩০০ জন বিক্রেতা কিডনি প্রদান অপারেশনের পর তাঁদের স্বাস্থ্যের ২২ থেকে ৫৮ শতাংশ অবনতি হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন (জারগুশি, ২০০১ক: ১৭৯০)।

ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত গবেষণাপত্রের বরাতে জানা যায় যে কিডনি বিক্রির স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি মারাত্মক। অপারেশনের পর তাঁদের কেউই প্রতিশ্রুত অপারেশন-পরবর্তী সেবা পান না, এমনকি ডাক্তারের একটি সাক্ষাৎ পর্যন্ত তাঁদের কপালে জোটে না। এককথায় বলা যায়, কিডনি বিক্রির সাথে জড়িত উপরোল্লিখিত শারীরিক ক্ষতি এবং সামাজিক দুর্দশা নিশ্চিতভাবেই জানান দিচ্ছে যে এই জৈব সন্ত্রাস চরম সমস্যাজনক এবং ভীষণ অনৈতিক।

জৈব সন্ত্রাসের ব্যবচ্ছেদ : বাংলাদেশে অঙ্গ জোগানে দৈহিক, কাঠামোগত ও সিমবোলিক সন্ত্রাস

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে নেওয়ার এই জৈব সন্ত্রাসের জন্ম অঙ্গ প্রতিস্থাপন প্রযুক্তির বিকাশের সাথে সম্পর্কিত, দরিদ্র জনগণের ওপর দমন-পীড়নের সাথেও এর ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র। জৈব সন্ত্রাস কেবলমাত্র অঙ্গ পণ্যায়নের চলমান প্রক্রিয়ার সাথেই সম্পর্কিত নয়, অঙ্গ প্রতিস্থাপন প্রযুক্তির প্রতিটি দিকের সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে। আমার মতে, জৈব সন্ত্রাস মারাত্মক শোষণমূলক এবং ভীষণ অনৈতিক। কিন্তু এটিকে কায়েমি স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর স্বার্থে অত্যন্ত সচেতনভাবে আড়াল করে রাখা হয়েছে। আমি দেখেছি কিভাবে বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষ এই জৈব সন্ত্রাসের নির্মম শিকারে পরিণত হচ্ছে এবং তাঁদের কিডনি বিক্রেতায় পরিণত করে চরম দুর্দশার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এই আলোচনার বাকি অংশে আমি কিডনি বিক্রেতার ওপর শারীরিক, কাঠামোগত ও সিমবোলিক ভায়োলেন্সের রকমফের নিয়ে আলোচনা করব।

বাংলাদেশে প্রায় সাড়ে তিন কোটি মানুষ (যা মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ) ক্ষুধার সন্ত্রাসের শিকার। অমর্ত্য সেনের ভাষায় এটি মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ (হার্টম্যান ও বয়েস, ১৯৯৮; সেন, ১৯৮২)। ৭৭ শতাংশ দরিদ্র বাংলাদেশি সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মতো জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম উপকরণ থেকে বঞ্চিত। ৫০ শতাংশ নারী রক্তস্বল্পতায় ভুগছে, সেই সাথে ২০ লাখ শিশু মারাত্মক পুষ্টিহীনতায় ভুগছে (জাতিসংঘ, ২০০৯)। পানিতে আর্সেনিক, বায়ুদূষণ, যথেচ্ছ কীটনাশকের ব্যবহার, তামাক সেবনসহ নানাবিধ সামাজিক-পরিবেশগত কারণে পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়েছে; যার ফলে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অসুখ বেড়েছে। অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণই এর প্রধান ভুক্তভোগী এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অকার্যকর হয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে তাঁরাই বেশি থাকেন এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অঙ্গ প্রতিস্থাপন কিংবা কিডনি ডায়ালাইসিসের সুযোগ না পাওয়ায় তাঁদের অকালে মরতে হয়।

বাংলাদেশে কিডনি প্রতিস্থাপন অন্যতম ব্যয়বহুল চিকিৎসা প্রক্রিয়া, যেখানে ন্যূনতম খরচ প্রায় দুই লাখ ২৫ হাজার টাকা। এদেশে নিম্নবিত্ত, এমনকি অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষেও এই পরিমাণ টাকা সঞ্চয় করা সম্ভব হয় না। অনেক সময়ই দেখা যায়, তাঁরা অর্থ সাহায্য চেয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন, যাতে প্রায় সময়ই আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায় না।[৭] কিডনি প্রতিস্থাপনের এক মাসের মধ্যে মারা যাওয়া এক রোগীর ভাইয়ের সাথে আমার কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে পুরো পরিবার তাঁর ভাইকে বাঁচানোর জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিল। সোনা-গয়না, জমি বিক্রি করে দিয়েছিল। ব্যাংকের কাছ থেকে টাকা ঋণ নিয়েছিল। কিন্তু তাঁর ভাইকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। এখন তাঁর পরিবার বিশাল ঋণের বোঝা টানছে। বাংলাদেশে এ ধরনের বিশেষায়িত চিকিৎসাসেবা মাত্র দুটি প্রধান নগরে কেন্দ্রীভূত। এ কারণে বেশির ভাগেরই ন্যূনতম সেবা পাওয়ার সুযোগটুকুও নেই।

> এই দেহ হারিয়ে বিদেহী হওয়া এবং নিজের অস্তিত্ব নিয়ে যন্ত্রণার ফলে বাংলাদেশি কিডনি বিক্রেতাদের আত্মসত্তা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এটা স্পষ্ট যে অঙ্গ প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়ায় সকলের জন্য সমান সুবিধা লাভের কোনো ব্যবস্থা নেই। গরিবরা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নানাবিধ সমস্যায় ভোগে আর সেবা পায় ধনীরা। প্রতিস্থাপনের পূর্ব এবং পরবর্তী সেবা-শুশ্রূষা ভোগ করে মাত্র ১ শতাংশ মানুষ, যারা প্রধানত ধনিক শ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী। অন্যদিকে বেশির ভাগ গরিব রোগীই নীরবে মৃত্যুবরণ করে একরকম বিনা চিকিৎসায়; প্রযুক্তির সুফল পেলে যাদের হয়তো বাঁচানো যেত। অঙ্গ প্রতিস্থাপনের এই পক্ষপাতদুষ্ট অমানবিক প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই গরিবের বিরুদ্ধে 'কাঠামোগত সন্ত্রাস' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে (এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন গুলতাং, ১৯৬৯ এবং ফারমার, ২০০৫-এ)।

গরিব মানুষেরা যে এ প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত, শুধু তা-ই নয়; বরং দেহ থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ বের করে নেওয়ার মতো একটি নির্মম প্রক্রিয়ার করুণ শিকারও বটে। আমার অনুসন্ধানে আমি দেখেছি, ধনী কিডনি গ্রহীতা এবং দালালরা গরিব মানুষের কিডনি বিষয়ক অজ্ঞতার সুযোগ নেন। বেশির ভাগ বিক্রেতা জানেনই না যে, কিডনি শরীরের কতটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আর এই সুযোগে কিডনি গ্রহীতারা কিডনি বিক্রিকে 'দান' হিসেবে প্রচার করে এর মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন। সেই সাথে পুরো প্রক্রিয়াটি নির্ঝঞ্ঝাট ও নিরাপদ বলে প্রচার করে কিডনি বিক্রিতে গরিব মানুষকে আগ্রহী করে তোলেন। এর মাধ্যমে যিনি কিডনি বিক্রয়ে রাজি হন, অপারেশনের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে তাঁর কিডনিচ্ছেদ করা

হয়। এর পরের টাকা হস্তান্তরের প্রক্রিয়াটি এতটাই শঠতাপূর্ণ যে শুধুমাত্র দালাল দ্বারাই কিডনি বিক্রেতা প্রতারিত হন না, বরং কিডনি গ্রহীতাও অনেক সময়ই প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদান করতে গড়িমসি করেন। উদারহণস্বরূপ কিডনি বিক্রেতা মনুর কথা এখানে উল্লেখ করা যায়, যিনি মাত্র ৪০ হাজার টাকা পেয়েছেন, যা তাঁকে প্রতিশ্রুত অর্থের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। কোনো কোনো ক্রেতাকে কিডনি সংগ্রহে বিক্রেতার ওপর চাপ প্রয়োগ করতেও দেখা যায়। এমনই এক হতভাগ্য কিডনি বিক্রেতা হচ্ছেন মফিজ। যৌতুকের টাকা জোগাড়ে কিডনি বিক্রি করতে চলে যাওয়া ভাইয়ের খবরে তাঁর বোন হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যুবরণ করেন। এ সংবাদ পাওয়ার পরও তিনি তাঁর বোনের জানাজায় পর্যন্ত অংশ নিতে পারেননি। কারণ তখন ইতিমধ্যেই তাঁকে তাঁর কিডনি গ্রহীতার বাসায় বন্দি করে ফেলা হয়েছে। এর কিছুদিন পর কিডনি প্রতিস্থাপন করতে তাঁকে জোর করে ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রতিস্থাপন-পরবর্তী সময়ে পাওনা টাকা দাবি করলে তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রীকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা হয়। এমনকি জেলে ঢুকিয়ে দেওয়ার হুমকি পর্যন্ত তাঁদের দেওয়া হয়। তাছাড়া সম্মতি আদায় করার প্রক্রিয়াটিও পুরোপুরি ত্রুটিপূর্ণ, কেননা ক্রেতা এক্ষেত্রে বিক্রেতাকে বিভ্রান্তিকর ও অপর্যাপ্ত তথ্য প্রদান করেন (যেমন: ঘুমন্ত কিডনির গল্প) এবং বিক্রেতারা স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন না (নানা প্রতারণা ও কৌশলের শিকার হতে হয়, সেই সাথে দারিদ্র্যের চাপ তো আছেই)। এমনিভাবে ধনী কিডনি ক্রেতা শারীরিক সন্ত্রাসের মাধ্যমে দরিদ্র কিডনি বিক্রেতাকে শোষণ করে।

বায়োভায়োলেন্স একই সাথে শোষণমূলক ও অনৈতিক, কারণ এর মাধ্যমে আর্থিক সক্ষমতায় নিচের দিকে থাকা মানুষের অসহায়ত্বকে পুঁজি করে দীর্ঘজীবন লাভ করছে সমাজের ওপরতলার কিছু মানুষ। এই ভয়ংকর সন্ত্রাসী প্রক্রিয়ায় ধনী গ্রহীতাই সব কিছুর সুবিধাভোগী। অন্যদিকে গরিব বিক্রেতার ভূমিকা মারাত্মক যন্ত্রণার বিনিময়ে অঙ্গের জোগানদাতা হিসেবে। এই জৈব সন্ত্রাস মানবাধিকারেরও লঙ্ঘন (১৯৪৮ সালের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র অনুযায়ী সুস্বাস্থ্য মানুষের অধিকার) কেননা অঙ্গ প্রতিস্থাপনসেবা পাওয়া গরিবেরও অধিকার, অথচ বাস্তবে তারা কেবল তাদের অপুষ্ট শরীর থেকে অঙ্গই হারায়। এই প্রক্রিয়াটির মধ্য দিয়ে সমাজে এক ধরনের অনাচারও প্রতিষ্ঠা লাভ করছে। কেননা গরিব মানুষেরও ধনীদের মতো অঙ্গ সুরক্ষার সমান অধিকার রয়েছে, যা এই জৈব সন্ত্রাসের মাধ্যমে লঙ্ঘিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের অঙ্গ কেনাবেচার বাজারে জৈব সন্ত্রাস সর্বব্যাপী হলেও কিছু কায়েমি স্বার্থবাদী গোষ্ঠী, যেমন: কিডনি গ্রহীতা, দালাল, চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ, ব্যবসায়ী এটিকে আড়াল করে রাখতে সক্ষম হয়েছে। এই সকল প্রভাবশালী গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থে জৈব সন্ত্রাস চালাচ্ছে আর তা আড়াল করছে সিমবোলিক ভায়োলেন্সের মাধ্যমে। সিমবোলিক ভায়োলেন্স অঙ্গের পণ্যায়নকে মুমূর্ষু রোগীর জীবন রক্ষার জন্য অত্যাবশ্যকীয় হিসেবে উপস্থাপন করে [পিয়েরে বোর্দুর মতে, সিমবোলিক ভায়োলেন্স হলো `the violence which is exercised upon a social agent with his or her complicity অর্থাৎ এমন এক সন্ত্রাস, যার মাধ্যমে সমাজের কোনো একটি ব্যক্তি/গোষ্ঠী/শ্রেণির সম্মতি নিয়েই তার বা তাদের ওপর নিপীড়ন চালানো হয়, আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা হয়– অনুবাদক] (সিমবোলিক ভায়োলেন্সের ওপর বিস্তারিত আলোচনা দেখুন বোর্দু, ১৯৯০ এবং লক, ২০০০-এ)। এই ধরনের সিমবোলিক ভায়োলেন্স অঙ্গ পণ্যায়নের মতো বেআইনি কাজের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা ও গরিবের বিরুদ্ধে চালিত বায়োভায়োলেন্সকে আড়ালে রাখার কাজ করে চলেছে।

সাক্ষাৎকারপ্রদানকারী অনেক কিডনি গ্রহীতা, যাঁরা কিডনি ক্রয় করেছেন, তাঁরা এই সন্ত্রাসের বিষয়টি স্রেফ নাকচ করে দিয়ে বলেছেন যে পরিবারের সদস্যদের সাথে টিস্যু না মেলার কারণে বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো সদস্যই কিডনি প্রদানে রাজি না হওয়ার কারণে কিডনি ক্রয় ব্যতীত তাঁদের অন্য কোনো উপায় ছিল না। বৈশ্বিক অঙ্গপাচার সংক্রান্ত চিকিৎসাবিষয়ক পত্রপত্রিকা এবং জার্নালগুলো এই বলে কিডনি ক্রয়-বিক্রয়কে জায়েজ করার চেষ্টা করে যে কিডনি গ্রহীতারা কারো কাছ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিডনি লাভে ব্যর্থ হয়েই জীবন বাঁচাতে কিডনি ক্রয় করতে বাধ্য হয়। অথচ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ কিডনি বাজারের ওপর আমার করা গবেষণায় আমি দেখেছি, যাদের কেনার ক্ষমতা আছে তারা পরিবারের সদস্যদের সাথে কিডনি দানের কথাবার্তা না বলেই কিডনি কিনতে উদ্যোগী হয়। উদারহণস্বরূপ, ২৭ বছর বয়সী ফ্যাশন ডিজাইনার উম্মে হাবিবা দীপনের কথা উল্লেখ করা যায়। মধ্যবিত্ত পরিবারের দীপনের চিকিৎসায় অর্থ জোগানে ২০০৬ সালে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সেই টাকা দিয়ে সে এক গরিব মানুষের কিডনি ক্রয় এবং প্রতিস্থাপনের যাবতীয় খরচাপাতি মেটায়।

দীপনের ঘটনার অনৈতিক দিকটি এই যে, তিনি সাহায্যের টাকা একটি অবৈধ বাণিজ্যে ব্যবহার করেছেন এবং তাঁর কিডনি কেনাকাটার এই ঘটনাটিকে গোপন রাখার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এক বন্ধুর কাছ থেকে ঘটনাটি জানার পর আমি বেশ কয়েকবার দীপনের স্বামীকে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি কেন তাঁর নিজের একটি কিডনি দীপনকে দেননি। শেষ পর্যন্ত তিনি স্বীকার করেছেন যে, সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হওয়ায় স্ত্রীকে কিডনি দিয়ে নিজের জীবন নিয়ে কোনো জুয়া খেলতে চাননি। কিন্তু স্ত্রীর জীবন বাঁচাতে তিনি মরিয়া ছিলেন বলেই অভাবী কিন্তু সুস্থ একজনকে খুঁজে বের করেছেন এবং তাঁর একটি কিডনি কিনেছেন। অন্যদিকে আমি এমনও দেখেছি যে, ৭২ বছর বয়স্ক এক ধনী ব্যক্তি ২২ বছর বয়সী বস্তিতে বাস করা একজন তরুণের কিডনি কিনে নিয়েছেন। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, ঐ ধনী ব্যক্তিটি এমন এক ইসলামপন্থী দলের সদস্য ছিলেন, যেখানে অঙ্গ বেচাকেনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অবশ্য কিডনি প্রতিস্থাপনের পূর্বেই তিনি মারা যান। কোনো কোনো ধনী কিডনি গ্রহীতা প্রথম প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া ব্যর্থ হওয়ার পর দ্বিতীয়বার কিডনি কেনার মতো ঘটনাও ঘটেছে। যাঁরা কিডনি বিক্রি করেছেন, তাঁদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে আমি জানতে পেরেছি যে কিডনি ক্রয় প্রক্রিয়া তুলনামূলক সহজ এবং নির্ঝঞ্ঝাট হওয়ায় কোনো ক্রেতাই পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে কিডনি চাননি। বরং তাঁরা সরাসরি সম্ভাব্য বিক্রেতাদের সাথেই যোগাযোগ করেছেন। আমি জানি না কতজন ক্রেতা এমন মনোভাব পোষণ করেন, কিন্তু অধিকাংশই তাঁদের কিডনি কেনার কাজটিকে সিমবোলিক ভায়োলেন্সের মাধ্যমে জীবন বাঁচানোর জন্য অপরিহার্য হিসেবে উপস্থাপন করেন।[৮]

> সমাজে অঙ্গ বিক্রির ধারণার সাথে চরম লজ্জাকর অসহায়ত্বের যোগসূত্র থাকায় কিডনি বিক্রির পর বিক্রেতারা এ ঘটনা লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে শতকরা ৭৯ জন বিক্রেতা সমাজবিচ্যুত হয়ে পড়েন।

খ্যাতনামা বাংলাদেশি বিশেষজ্ঞরা প্রায়শই জনসমক্ষে বলে থাকেন যে 'জীবন বাঁচানো' তাঁদের নৈতিক দায়িত্ব, অথচ পেশাগত মূল্যবোধের দোহাই পেড়ে অঙ্গের পণ্যায়নের বিষয়টি তাঁরা দেখেও না দেখার ভান করেন। প্রতিবছর বিশ্ব কিডনি দিবসে এই বিশেষজ্ঞরা আমাদের মনে করিয়ে দেন যে প্রতিবছর প্রায় ৪০ হাজার বাংলাদেশি মারা যায় কিডনি বৈকল্যের কারণে, তার মানে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় পাঁচজন (হাসিব, ২০১১), অথচ এদের অধিকাংশকেই কিডনি প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে সহজেই বাঁচানো যেত। প্রায়শই তাঁরা অঙ্গ প্রতিস্থাপনে তাঁদের সাফল্যকে আন্তর্জাতিক মানের সমতুল্য বলে দাবি করেন (দেখুন রশিদ, ২০০৪: ১৮৭)। তাঁরা মনে করেন, অপ্রতুল কিডনিদাতা ও অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য অবকাঠামোর কারণেই এদেশে প্রতিস্থাপন শিল্প বিকশিত হতে পারছে না।

এই বিশেষজ্ঞরা তাই জনগণকে আহ্বান জানান জীবনকে উপলব্ধি করতে এবং অঙ্গদানকে চিহ্নিত করেন এক মহত্তম কাজ হিসেবে। জাতীয় কিডনি ইনস্টিটিউটের অনেক কর্তাব্যক্তিই আবার 'অঙ্গ প্রতিস্থাপন আইন' সংশোধনের দাবিও তোলেন। বর্তমান আইনে রক্ত সম্পর্কের কেউই শুধু কিডনি দান করতে পারেন, যেটিকে তাঁরা আরো শিথিল করতে চান (নিউ নেশন, ২০০৮: ২)।

এভাবে একদিকে তাঁরা এটিকে একটি মহত্তম কাজ বলে প্রচার করেন এবং অন্যদিকে এর পণ্যায়নের বিষয়টি জনগণ থেকে আড়ালে রাখেন। এটাকে এক সিমবোলিক ভায়োলেন্স বলেই আমি মনে করি এবং আমাকে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য করে সেটি হচ্ছে অঙ্গ ব্যবসায় এই বিশেষজ্ঞদের যথেচ্ছ ক্ষমতা। এখন পর্যন্ত তাঁরা অঙ্গ প্রতিস্থাপনে কোনো ধরনের অবৈধ লেনদেনের কথা স্বীকার তো করেনই না, বরং এদেশে এটাকে বেশ কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় বলে দাবি করেন।[৯] মাঠপর্যায়ে গবেষণা চলাকালে আমি এক বিখ্যাত কিডনি বিশেষজ্ঞকে তাঁদের পাঠকক্ষের দরজায় লাগানো একটি বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। বিজ্ঞাপনটি ছিল কিডনি বিক্রয়ে আগ্রহী এক ব্যক্তির। তখন তিনি দাবি করেন, এইসব অবৈধ কিডনি প্রতিস্থাপনের (যারা রক্ত সম্পর্কে সম্পর্কিত নয়) সব কিছুই নাকি দেশের বাইরে হয়ে থাকে। আমি আরো লক্ষ করলাম যে স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের কেউই এ বিষয়ে একটিও প্রতিবেদন লেখা তো দূরে থাক, বরং তাঁদের মুখপত্রে (রেনাল জার্নাল অব বাংলাদেশ) তাঁরা এটিকে বরাবরই অস্বীকার করে আসছেন। যা হোক, আমি যখন আমার নেওয়া সাক্ষাৎকারগুলো থেকে পর্যাপ্ত তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করে ওই বিশেষজ্ঞকে বলি যে আমার কাছে তাঁর মতামতের বিপরীত তথ্য-প্রমাণ রয়েছে, তখন তিনি বেশ শান্ত স্বরেই আমাকে বলেন, 'আমরা সব সময়ই চেষ্টা করি নৈতিক আচরণবিধি বজায় রাখার, কিন্তু মাঝে মাঝে আমাদের অগোচরে কিছু বিচ্যুতি ঘটে থাকতে পারে।' তাঁর এই বক্তব্যটিকেও চ্যালেঞ্জ করলে তিনি সুর পাল্টে বলেন যে তাঁরা কিডনি বিশেষজ্ঞরা তো আর পুলিশ নন, আর কিডনিদাতাদের ওপর গোয়েন্দাগিরি করাটাও তাঁদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। হতে পারে কিডনি বিশেষজ্ঞদের ভূমিকা সীমিত, কিন্তু তাঁকে আমার জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল, কেন তাঁরা বেআইনি অঙ্গ বাণিজ্য দেখেও না দেখার ভান করেন।

বাংলাদেশি কিডনি বিক্রেতাদের শতকরা ৭৮ জনের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটেছে; বহুজন কর্ম হারিয়ে বেকার জীবন যাপন করছেন। যাঁরা কাজ করছেন, তাঁরাও কেবল একটি কিডনি নিয়ে শারীরিক দুর্বলতার কারণে পুরো সময় কাজ করতে পারছেন না।

আমার মনে হয়, আমার নিজের এই প্রশ্নের উত্তরটি হতে পারে এ রকম : নয়া উদারনৈতিক বাজার অর্থনীতি অনেক বাংলাদেশি স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞকে পরিণত করেছে 'একের ভেতরে তিন' ব্যক্তিসত্তায়—ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ ও চিকিৎসকে, আমাকে সাক্ষাৎকার প্রদানকারী একজনের মতানুসারে, যাঁরা একদিকে কিডনি ব্যবসাকে অস্বীকার করেন আর অন্য দিক থেকে এই ব্যবসা থেকে প্রচুর উপার্জন করেন। এই শিল্প সম্প্রসারণে তাঁদেরই লাভ; যত প্রতিস্থাপন, তত উপার্জন—এই হলো তাঁদের নীতি। সেজন্যই তাঁদের দরকার হয় এটিকে আড়াল করার এবং সেজন্যই তাঁরা এই ব্যবসার ব্যক্তিমালিকানাধীন অংশে প্রচুর বিনিয়োগ করেন এবং দালালদের সাথে বেশ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রাখেন। আমার মূল তথ্যদাতা দালাল আমার কাছে দাবি করেছে যে সে বেশ কয়েকজন কিডনি বিক্রেতাকে কতিপয় কিডনি বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে এসেছে, যারা অর্থের বিনিময়ে পরবর্তী কাজ পুরোটাই সামলেছে।

এই বিশেষজ্ঞরা যদিও সরকারি বিভিন্ন হাসপাতালে কর্মরত, তবু তাঁরা উঁচু ফি দিয়ে তাঁদের প্রাইভেট চেম্বারে না আসা পর্যন্ত রোগীদের ঠিকঠাক দেখভাল করেন না। তাঁরা আবার বিভিন্ন ডায়াগনস্টিক টেস্ট থেকেও কমিশন পেয়ে থাকেন। তাঁরা এমনকি কাস্টমারদের নিয়ে নিজেদের মধ্যে টানাহেঁচড়া করতেও ছাড়েন না। বাংলাদেশ কিডনি রোগী কল্যাণ সংস্থার একজন আমাকে বলেছেন যে এই বিশেষজ্ঞরা সংস্থাটিকে একদমই সহ্য করতে পারেন না; কেননা তাঁরা বছরে একবার একজন ভারতীয় বিশেষজ্ঞকে ডাকেন অপারেশন-পরবর্তী চেক-আপের জন্য। কারণটি খুব সহজেই অনুমেয়। এই দৌড়ে ওষুধ বিপণনকারী সংস্থা (যেমন: Novartis ও Roche, যারা অঙ্গ প্রতিস্থাপনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ Cyclosporine ও Cellcept এর প্রস্তুতকারী) বেশ ভালোভাবেই আছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষজ্ঞদের বিদেশে বিভিন্ন কনফারেন্সে পাঠায় এবং প্রতিদানে এই বিশেষজ্ঞরাও কেবল তাদের ওষুধগুলোই ব্যবস্থাপত্রে লিখে থাকেন। তাঁদেরই একজন একবার বেশ অপ্রত্যাশিতভাবে আমাকে জানান যে, এই "Big Pharma" গুলো নিয়মিত তাদের জার্নালে (রেনাল জার্নাল অব বাংলাদেশ) বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে।

বাংলাদেশি বিশেষজ্ঞরা এই অবৈধ ব্যবসায় সরাসরি অংশগ্রহণ করেন না বলেই দাবি করে থাকেন, কিন্তু আমি আমার মাঠপর্যায়ের গবেষণায় দেখেছি, এঁরা বেশ সতর্কতার সাথে এই ব্যবসাটিকে আড়াল করে রাখেন। একজন কিডনি বিশেষজ্ঞ আমার কাছে দাবি করেছিলেন যে তাঁর হাসপাতালে কিডনি প্রতিস্থাপন কোনোভাবেই সম্ভব নয়, কেননা এতে বিভিন্ন পেশার, যেমন: নেফ্রোলজিস্ট, ইউরোলজিস্ট, সাইকোলজিস্ট, এমনকি একজন সমাজকর্মীরও অনুমতি নেওয়ার দরকার পড়ে চূড়ান্ত প্রতিস্থাপনের পূর্বে। বিপরীতে আমি জানতে পারি যে, এই সম্মতিপত্রগুলো যথাযথ ব্যক্তিদের পাঠানোই হয় না! একজন সমাজকর্মী তো আমার জিজ্ঞাসাবাদে আকাশ থেকে পড়েন, তিনি আমাকে এই রকম একটি সম্মতিপত্র দেখাতে বলেন এবং এ রকম কোনো আইন যে আদতেই আছে সেটা জানতেন না বলে স্বীকার করেন। এভাবেই এই বিশেষজ্ঞরা আরামে এই ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন জীবন রক্ষার নাম দিয়ে, যেটাকে সিমবোলিক ভায়োলেন্স ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেই আমি রাজি নই।

এই সন্ত্রাসে দালালের দলের বাগাড়ম্বরগুলোও বেশ খেয়াল করার মতো। এরা প্রচার করে, এতে দুই পক্ষই লাভবান হচ্ছে। গরিব কিডনিদাতা যেমন টাকা-পয়সা পেয়ে উপকৃত হচ্ছে, তেমনি অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ব্যক্তিও কিছু টাকা-পয়সার বিনিময়ে জীবন ফিরে পাচ্ছে। এদেরই একজন আমাকে বলেছে, 'জীবন ও অর্থ— এই দুটির মধ্যে কোনটি বেশি প্রয়োজনীয়? যার অর্থ আছে তার কাছে জীবন আর যার জীবন আছে কিন্তু দরিদ্র তার কাছে অর্থ। তো কেন আমি এই দুজনের উপকার করব না?' অবশ্য সেই দালাল আমাকে বলেনি, কেমন করে যে কোনো মূল্যে অনৈতিকভাবে কিডনি কেটে নিয়ে সে বিপুল মুনাফা করছে। বেশ কয়েকজন সাক্ষাৎকারদাতা আমাকে বলেছেন যে এই দালালরা প্রকাশ্যেই ক্লায়েন্ট সংগ্রহে প্রতিযোগিতা করে এবং এদের নিরাপত্তা দেয় সমাজের ওপরের তলার লোকজন।[১০] এই দালালরা স্থানীয় থেকে জাতীয়, এমনকি একটি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কও গড়ে তুলেছে। এরা গরিব কিডনিদাতাদের ফাঁদে ফেলে এই বলে যে কিডনি প্রতিস্থাপন বেশ সহজ একটা বিষয় (যেমন: ঘুমন্ত কিডনির গল্প) এবং এতে সে বেশ ভালো কামাই করতে পারবে, যার মাধ্যমে দূর হবে তার দারিদ্র্য। আদতে বঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই পায় না কিডনি বিক্রেতা।

বাংলাদেশি গণমাধ্যমগুলোও, যার বেশির ভাগই ব্যক্তিমালিকানাধীন, এই অন্তর্গত সন্ত্রাসের (সিমবোলিক ভায়োলেন্স) সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো অঙ্গ প্রতিস্থাপন ব্যবসাকে অঙ্গদান নামে প্রচার করে জনগণের কাছ থেকে মূল সত্য গোপন করে থাকে। সংবাদপত্রের কিডনি ক্রয় সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনগুলো পড়লে আপনার মনে হবে যে তাঁরা

আসলে জীবন রক্ষাকারী একজন কিডনিদাতা খুঁজছেন, আর যিনি কিডনি বিক্রি করতে চান তাঁদের বিজ্ঞাপনের ভাষা থেকে আপনার মনে হবে, যেন তাঁরা একজন বিপদগ্রস্ত লোকের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন। এই শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপনগুলো প্রকাশ করে (যেগুলো দেখলে মনে হবে ক্রেতা ও বিক্রেতা কিডনি দানের কাজ করছেন) এবং কিডনির পণ্যায়ন ও এর সাথে সম্পর্কিত জৈব সন্ত্রাসের বিষয়ে রিপোর্ট প্রকাশ না করে বাংলা গণমাধ্যমগুলো কিডনি ব্যবসাকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে ভূমিকা রাখছে। কেননা এই গণমাধ্যমগুলোই ক্রমবর্ধমান অঙ্গ বাণিজ্যের প্রাথমিক তথ্য সরবরাহকারীর ভূমিকা পালন করে আসছে।

উপসংহার

কায়েমি স্বার্থবাদী গোষ্ঠী অঙ্গ বাণিজ্য নিয়ে চুপচাপ থাকলেও কিছু উদারনৈতিক জৈবনৈতিকতাবাদী নিয়ন্ত্রিত অঙ্গ বাজারের পক্ষে। তাদের মতে, একটা নিয়ন্ত্রিত অঙ্গ বাজার থাকলে তা মৃত্যুপথযাত্রী রোগীর জীবন বাঁচাতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে (চেরি, ২০০৫; ফ্রিডম্যান অ্যান্ড ফ্রিডম্যান, ২০০৬; হিপ্পেল, ২০০৫; মাতাস, ২০০৮; রেডক্লিফ-রিচার্ডস, ১৯৯৬; টায়লর, ২০০৫; ভিচ, ২০০)। আমি মনে করি, দরিদ্র কিডনি বিক্রেতাদের ওপর বায়োভায়োলেন্স চলতে দিয়ে এবং কতিপয় সম্পদশালীর জীবন রক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে এই জৈবনৈতিকতাবাদীরা এক ধরনের সিমবোলিক ভায়োলেন্স চালাচ্ছেন। নিয়ন্ত্রিত অঙ্গ বাজার তো আর আলাদীনের জাদুর প্রদীপ নয় যে তা নিজেই ব্যাপক বিস্তৃত প্রতারণা, কৌশল এবং মিথ্যা তথ্য দিয়ে আদায় করা সম্মতির সমস্যা নির্মূল করে ফেলবে কিংবা কিডনি বিক্রেতাদের জন্য ন্যায়বিচার, ন্যায্যতা এবং অধিকার নিশ্চিত করবে। বরং এই নিয়ন্ত্রিত বাজার শারীরিক ও সামাজিক যন্ত্রণা ভোগের উচ্চমূল্যের বিনিময়ে দরিদ্র সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের কাছ থেকে অঙ্গ খুলে নেওয়ার জৈব সন্ত্রাসকে আরো তীব্র করে তুলবে।

অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মারাত্মক বৈষম্যমূলক এই বায়োভায়োলেন্সকে তা একটি যৌক্তিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও স্বাভাবিক চেহারা দেবে। অবাক হওয়ার কিছু নেই, আমার কাছে সাক্ষাৎকার প্রদানকারী কিডনি বিক্রেতাদের ৮৫ শতাংশই অঙ্গ বাজারের বিরুদ্ধে বলেছেন। তাঁদের অনেকেই বলেছেন, কিডনি বিক্রি করলে যে ক্ষতি হয় তা অপূরণীয়; জীবনটা নতুন করে শুরু করার সুযোগ পেলে তাঁরা আর কিডনি বিক্রি করতেন না।

সংক্ষেপে, অঙ্গ সংস্থাপনের মাধ্যমে অনেকের জীবন রক্ষা পেলেও কিডনি বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে চালিত বায়োভায়োলেন্স একটি মারাত্মক সমস্যা। অঙ্গ সংস্থাপন শিল্পের বিকাশের সাথে সাথে দরিদ্র জনগণের বিরুদ্ধে চালিত বায়োভায়োলেন্স একটা ব্যাপকভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা পাচ্ছে। তাদের শরীর থেকে অঙ্গ কেটে নেওয়ার শারীরিক সন্ত্রাস ক্রমশ রুটিনে পরিণত হচ্ছে। এই শারীরিক সন্ত্রাসকে আবার এক সিমবোলিক ভায়োলেন্সের মাধ্যমে জায়েজ করা হচ্ছে, যা জীবন বাঁচানোর বাগাড়ম্বরের নিচে অঙ্গ বাণিজ্যকে ঢেকে রাখে। এর মধ্যেই কায়েমি সুবিধাভোগীদের ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে দরিদ্রের বিরুদ্ধে চালিত জৈব সন্ত্রাস আড়ালে পড়ে থাকে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শোষণকে আঘাত করার জন্য অঙ্গ সংস্থাপন বাণিজ্যসহ বিভিন্ন উদীয়মান জৈব প্রযুক্তি শিল্পের সাথে যুক্ত জৈব সন্ত্রাসের পুরো উন্মোচন ঘটানো দরকার। অঙ্গ সংস্থাপন নিয়ে একটি ইশতেহার রচনার এখনই সময়, যে ইশতেহারের ভিত্তি হবে সামাজিক ন্যায়বিচার এবং যে ইশতেহার মানবিক নৈতিকতার পৃষ্ঠপোষকতা করবে।

[লেখাটি মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্ট অব এনথ্রপোলজির সহকারী অধ্যাপক **মনির মনিরুজ্জামান** এর *"Living Cadavers" in Bangladesh: Bioviolence in the Human Organ Bazaar* শীর্ষক লেখার ঈষৎ সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। মূল লেখাটি Medical Anthropology Quarterly এর মার্চ ২০১২ সংখ্যায় প্রকাশিত। লেখাটি যৌথভাবে অনুবাদ করেছেন: **মাহবুব রুবাইয়াৎ, মওদুদ রহমান, তন্ময় কর্মকার ও ফুয়াদ মাহমুদ**।]

পাদটীকা

১. রিডাকশনিজমের ঝুঁকি নিয়েই, যাঁরা নিজেদের কিডনি বিক্রি করেছেন, তাঁদের আমি 'কিডনি বিক্রেতা' বলেছি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষ, যাঁরা বাজারে কিডনি বিক্রি করছেন, তাঁদের শুধুমাত্র ক্যাটাগরাইজ বা শ্রেণিবদ্ধকরণের জন্য এই টার্মটি ব্যবহার করেছি। পুরো লেখাটিতে কিডনি বিক্রেতারা পরিস্থিতির শিকার বিভিন্ন ব্যক্তি, পণ্যায়িত উপাদান নন।

২. এখন পর্যন্ত আমি সম্ভাব্য গ্রহীতা কর্তৃক দেওয়া ১১৩৯টি এবং বিক্রেতাদের তরফ থেকে দেওয়া ১৪৯টি বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করেছি, যেগুলো ২০০০ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ইত্তেফাক, যুগান্তর, প্রথম আলো, জনকণ্ঠ ও ইনকিলাব পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। নৃতত্ত্বের চার শিক্ষার্থী—সুদীপ্ত চৌধুরী, মহিতোষ সামি, আব্দুল্লাহ সুমন ও সানিয়া তানজিন মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগার থেকে ছয় মাসের গবেষণার মাধ্যমে এই শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপনগুলো খুঁজে পেতে সাহায্য করেছেন।

৩. দালালরা সাধারণত সম্ভাব্য গ্রহীতা হিসেবে বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে। অবশ্য একাধিক রক্তের গ্রুপের কিডনিদাতা চাওয়ার কারণে এই ধরনের বিজ্ঞাপনকে আলাদা করা সম্ভব।

৪. সাক্ষাৎকারের সময় বেশির ভাগ বিক্রেতাই বলেছেন, দালালরা বারবার ঘুমন্ত কিডনির গল্প বলে তাঁদের কিডনি বিক্রিতে উৎসাহিত করেছে। দালালদের কাছে জানতে চাইলে তারা জোর দিয়ে এটাকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলে দাবি করেছে; যদিও তথ্যের উৎস নিশ্চিত করতে পারেনি। একজন বলেছে, সে কিছু কিডনি বিশেষজ্ঞ ও গ্রহীতার কাছ থেকে গল্পটা শুনেছে।

৫. আমি কিছু পাসপোর্ট ও আইনি দলিল সংগ্রহ করেছি, যেখানে দেখা যাচ্ছে বিক্রেতার নাম ও ঠিকানা এমনভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে, যেন তাঁদেরকে নিকটাত্মীয় মনে হয়। নিয়মানুযায়ী এই পাসপোর্ট বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ইস্যু হওয়ার কথা এবং দলিল-দস্তাবেজ নোটারি পাবলিক কর্তৃক সত্যায়িত হওয়ার কথা।

৬. কিডনি বিক্রির ব্যাপারটা লুকানোর জন্য বিক্রেতারা প্রথম দিকে তাঁদের পরিবারকে জানান যে তাঁরা কয়েক মাসের জন্য দূরের শহরে কাজ করতে যাচ্ছেন।

৭. প্রতিদিনই বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলোর নির্দিষ্ট একটি অংশে জীবনরক্ষার্থে দরিদ্র মানুষের চিকিৎসার জন্য অর্থ সাহায্যের আবেদন প্রকাশিত হয়। এগুলো এত ঘন ঘন ছাপা হয় যে স্থানীয় বাংলাদেশিরা আর এসবে খুব একটা মনোযোগ দেন না।

৮. অবশ্য এ রকমও অনেক ধনাঢ্য ও মধ্যবিত্ত বাংলাদেশি গ্রহীতাকে পাওয়া যাবে, যাঁরা চিকিৎসাজনিত ও নৈতিক কারণে কিডনি ক্রয় করেননি। তাঁদের কেউ কেউ আমাকে বলেছেন, তাঁরা কিডনি কেনেননি, কারণ নিকটাত্মীয়ের কাছ থেকে নেওয়া কিডনি সংস্থাপনের সাফল্যের হার তুলনামূলক বেশি। কেউ
কেউ বলেছেন, অঙ্গ বাণিজ্য অনৈতিক ও বেআইনি বলে তাঁরা কিডনি ক্রয় করেননি।

৯. ট্রান্সপ্লান্ট সোসাইটির প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশি একজন কিডনি বিশেষজ্ঞকে আমার গবেষণার মূল বক্তব্য এবং অঙ্গ পাচার সম্পর্কিত ইস্তানবুল ঘোষণা ই-মেইল করে মতামত জানতে চাইলে তিনি উত্তর দিয়েছেন, ট্রান্সপ্লান্ট অ্যাক্ট বাংলাদেশে 'কঠোরভাবে মেনে চলা হয়'।

১০. আমি এমনকি আমার কাছে সাক্ষাৎকারদাতা একজন কিডনি বিক্রেতাকে ঢাকার বারডেম হাসপাতালে ডায়ালাইসিস ইউনিটে দালালি করতে দেখেছি।

তথ্যসূত্র

[বাংলাদেশ গ্যাজেট] Bangladesh Gazette (1999), *Manobdehe Anga-Protongo Shongjojoner Bidhar Korar Uddeshe Pronito Ayen*

[Transplantation of human body parts act], Bangladesh Gazette, April 13:17–21.

[বোর্দু] Bourdieu, Pierre(1990), *In Other Words: Essays Towards a Reflexive Sociology,* Stanford: Stanford UniversityPress.

[ব্রুজোন এবং বারলোকো] Bruzzone, P., and P. Berloco(2007), *"Ethical Aspects of Renal Transplantation from Living Donors"*, Transplantation Proceedings, vol. 39, no. 6, pp. 1785–1786.

[বুদিয়ানি-সাবেরি ও দেলমোনিকো] Budiani-Saberi, Debra, and Francis Delmonico (2008), *"Organ Trafficking and Transplant Tourism: A Commentary on the Global Realities"*, American Journal of Transplantation, vol. 8, no. 5, pp. 925–929.

[চ্যাপম্যান] Chapman, Jeremy (2008), *"Should We Pay Donors to Increase the Supply of Organs for Transplantation?"* British Medical Journal 336(June 14), p,1343.

[চেরি] Cherry, Mark (2005), *Kidney for Sale by Owner: Human Organs, Transplantation, and the Market,* Georgetown: Georgetown University Press.

[কোহেন] Cohen, Lawrence (1999), *"Where It Hurts: Indian Material for an Ethics of Organ Transplantation"*, Daedalus, vol.128, no. 4, pp. 135–164.

[দানোভিচ] Danovitch, Gabriel (2008), *"Who Cares? A Lesson from Pakistan on the Health of Living Donors"*, AmericanJournal of Transplantation, vol. 8, pp. 1361–1362.

[ফারমার] Farmer, Paul (2005), *Pathologies of Power: Health, Human Rights, and New War on the Poor,* 2nd edition, Berkeley: University of California Press.

[ফক্স ও সোয়াজেয়ি] Fox, Renee, and Judith Swazey (1992), *Spare Parts: Organ Replacement in Human Society,* London: Oxford UniversityPress.

[ফ্রিডম্যান এন্ড ফ্রিডম্যান] Friedman, E, A,, and A, L, Friedman (2006), *"Payment for Donor Kidneys: Pros and Cons"*, Kidney International, no. 69, pp. 960–962.

[গুলতাঙ] Galtung, Johan (1969), *"Violence, Peace, and Peace Research"*, Journal of Peace Research, vol, 6, no, 3:167–191.

[গয়াল ও অন্যান্য] Goyal, Mahdav, Ravindra Mehta, Lawrence Schneiderman, and Ashwini Sehgal (2002), *"Economic and Health Consequences of Selling a Kidney in India"*, Journal of theAmerican Medical Association, no, 288, pp. 1589–1593.

[হেজেস এন্ড গেইনস] Hedges, Stephen, and William Gaines (2000), *"Donor Bodies Milled into Growing Profits"*, Chicago Tribune, May 21.

[হার্টম্যান ও বয়েছ] Hartman, Betsy, and James K, Boyce (1998), *A Quiet Violence: View from a Bangladesh Village,* 7th edition, London: Zed.

[হাসিব] Hasib, Nurul Islam (2011), *"Kidney Patients: 18min and counting"*, available at bdnews24.com, http://www,bdnews24,com/details,php?cid=13&id=189346&hb=1, accessed March 10, 2011.

[হিপ্পেন] Hippen, Benjamin(2005), *"In Defense of a Regulated Market in Kidneys from Living Vendors"*, Journal of Medicine and Philosophy, no, 30, pp. 593–626.

[জোরালেমন] Joralemon, Donald (2001), *"Shifting Ethics: Debating the Incentives Question in Organ Transplantation"*, Journalof Medical Ethics, vol. 27, no.1, pp. 30–35.

[কোচ] Koch, Thomas (2002), *Scarce Goods: Justice, Faimess, and Organ Transplantation,* Westport, CT: Praeger.

[লক] Lock, Margaret (2000), "The Quest for Human Organs and the Violence of Zeal" in Veena Das, Arthur Kleinman, Mamphela Ramphele, and Pamela Reynolds (eds,), *Remaking a World: Violence, Social Suffering, and Recovery,* pp. 271–295, Berkeley: University of California Press.

[মাতাস] Matas, Arthur (2008), *Should We Pay Donors to Increase the Supply of Organs for Transplantation?Yes*, British Medical Journal 336:1342.

[মোয়াযাম এবং অন্যান্য] Moazam, Farhat, Riffat Moazam Zaman and Aamir M, Jafarey (2009), *"Conversations with Kidney Vendors in Pakistan: An Ethnographic Study"*, Hastings Center Report, vol, 39, no. 3, pp. 29–44.

[নাকভিএবং অন্যান্য] Naqvi, Syed Ali Anwar, Bux Ali, Farida Mazhar, Mirza Naqi Zafar, and Syed Abidul Hasan Rizvi (2007), *"A Socio-Economic Survey of Kidney Vendors in Pakistan"*, Transplant International, no. 20, pp. 934–939.

[নাকভিএবং অন্যান্য] Naqvi, S. A., S. A. Rizvi, M. N. Zafar, E. Ahmed, B. Ali, K. Mehmood, M. J. Awan,B, Mubarak, and F. Mazhar (2008), *"Health Status and Renal Function Evaluation of Kidney Vendors: A Report fromPakistan"*, American Journal of Transplant, vol. 8, no. 7, pp.1444–1450.

[নিউ ন্যাশন] New Nation (2008), *"Quality Kidney Treatment Available in Country"*, New Nation, October 12, p,1.

[রেডক্লিফ-রিচার্ডস] Radcliffe-Richards J,(1996), *"Nefarious Goings On: Kidney Sales and Moral Arguments"*, Journal of Medicineand Philosophy, vol. 21, no. 4, pp. 375–416.

[রশিদ] Rashid, Harun-Ur (2004), *"Health Delivery System for Renal Disease Care in Bangladesh"*, Saudi Journal, Kidney Disease Transplant , vol,15, no, 2, pp,185–189.

[শেপার- হিউ] Scheper-Hughes, Nancy (2000), *"The Global Traffic in Human Organs"*, Current Anthropology, vol, 41, no, 2, pp, 191–224.

[শেপার- হিউ] Scheper-Hughes, Nancy (2003a), *"Rotten Trade: Millennial Capitalism, Human Values, and Global Justice inOrgans Trafficking.* Special issue, "Human Frailty"", Journal of Human Rights, vol, 2, no, 2, pp, 197–226.

[শেপার- হিউ] Scheper-Hughes, Nancy (2003b), *"Keeping an Eye on theGlobal Traffic inHuman Organs"*, Lancet, vol. 361, no. 9369, pp. 1645–1648.

[শেপার- হিউ] Scheper-Hughes, Nancy (2004), *"Parts Unknown: Undercover Ethnography of the Organs-Trafficking Underworld"*, Ethnography, vol, 5, no,1, pp, 29–73.

[শেপার- হিউ] Scheper-Hughes, Nancy (2005), *"Organs without Borders"*, Foreign Policy , no.146(Jan–Feb), pp. 26–27.

[সেন] Sen, Amartya (1982), *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation,* Oxford: Oxford University Press.

[শিমাজোনো] Shimazono, Yosuke (2007), *"The State of the International Organ Trade: A Provisional Picture Based on Integration of Available Information"*, Bulletin of the World Health Organization, vol. 85, no. 12, pp. 955–962.

[টায়লর] Taylor, James Stacey (2005), *Stakes and Kidneys: Why Markets in Human Body Parts Are Morally Imperative,* England: Ashgate.

[টোবের] Tober, Diane (2007), *"Kidneys and Controversies in the Islamic Republic of Iran: The Case of Kidney Sale"*, Body and Society, no. 13, pp. 151–171.

[জাতিসংঘ] United Nations (2009), *"2 Million Children Wasting in Bangladesh"*, UN News Center, available at http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=30329, accessed March 30, 2009.

[ভিচ] Veatch, Robert (2000), *Transplantation Ethics,* Washington, DC: Georgetown University Press.

[জারগুশি] Zargooshi, Javad (2001a), *"Quality of Life of Iranian Kidney "Donors""*, Journal of Urology, no. 166, pp. 1790–1799.

[জারগুশি] Zargooshi, Javad (2001b), *"Iranian Kidney Donors: Motivations and Relations with Recipients"*, Journal of Urology, no, 165, pp. 386–392.